অশান্ত আসাম
— বিক্ষুব্ধ পূর্বাঞ্চল



বর্ণালী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া ৮ই অক্টোবর, ১৯৫৩.

প্রকাশক :
কান্তিরঞ্জন ঘোষ

প্রচ্ছদ :
পঞ্চানন মালাকর

মুদ্রক :
কমলকৃষ্ণ রায়
পারুল প্রেস
৩৮ সি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

আসাম-দুহিতা

শ্রীযুক্তা অমলপ্রভা দাস

—শ্রদ্ধাস্পদেষু

গোড়ার দিকে আসাম ও নাগাল্যানডের মধ্যে সীমানা নিয়ে একটা মর্মান্তিক সশস্ত্র ঘটনা ঘটে গেছে। এই ঘটনায় ঠিক কতজন নিহত হয়েছে, কতজন আহত এবং আরও কত-শত নিঃস্ব-নিরাশ্রয় হয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন পক্ষের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে প্রচুর মতানৈক্য আছে—কালক্রমে তা আরও বাড়বে। ঘটনার পর নয়াদিল্লি সমেত বিভিন্ন রাজধানীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা অনেকবার বৈঠক করেছেন। গুটিকয় যৌথ বিবৃতি এবং একটি 'সাময়িক সমঝোতা'র কথা ঘোষিত হয়েছে। সেই থেকে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে। করছে ঘটনাস্থলেও। অবশ্যই, যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী রক্তাক্ত ঘটনাটি না ঘটে, ততক্ষণ।

আসাম নাগাল্যাণ্ড সীমান্তের এইটেই সর্বপ্রথম ঘটনা নয়—বলা বাহুল্য, সর্বশেষ ঘটনাও নয়। নাগাল্যাণ্ডের জন্মেরও অনেক আগে থাকতেই এই বিরোধের অস্তিত্ব ছিল, সংঘর্ষও হত। তখন এর পরিচয় ছিল; 'জমি লইয়া উপজাতিদের অন্তরকলহ।' দেড় দশকের উপর হয়ে গেল ভারতবর্ষের মানচিত্রে পৃথক রাজ্য হিসাবে নাগাল্যাণ্ডের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু সেই সীমানা বিরোধের কোন সুরাহা হয়নি। এতদিন যা ছিল জেলা স্তরে, এবারে তা উন্নীত হল রাজ্য স্তরে। বিরোধটাও আরও জোরদার হল, জটিল হল, কুটিল হল—এবং মাঝে মাঝেই বিস্ফোরণ ঘটতে লাগল। আসাম নাগাল্যাণ্ড সীমানায় এর আগেও একাধিকবার গুলি বিনিময়ে বেশ কিছু সংখ্যক লোক হতাহত হয়েছে। প্রত্যেকবারই মন্ত্রীরা প্রচুর ছুটোছুটি করছেন—কিন্তু সমস্যাটির কোন সমাধান হয়নি। কিন্তু কেন?

মনে রাখা দরকার: আসামের এই সীমানা সমস্যা কেবল নাগাল্যাণ্ডের সীমানাতেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রায় সব কয়টি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সঙ্গেই আসামের সীমানা বিরোধ রয়েছে—মিজোরাম, মেঘালয়, অরুণাচল কেউ বাদ পড়েনি। সময়ে ভুটানের সঙ্গেও সীমানা বিরোধের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। বাদ কেবল ত্রিপুরা আর বাংলাদেশ—কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে।

মিজোরাম, মেঘালয়, অরুণাচল সীমানায়ও প্রত্যেক ঋতুতেই গোলমাল হয়। কখনো এই এলাকার লোক ওই এলাকার ধান কেটে আনে, কখনো ওই এলাকার লোক এসে এই এলাকার কাঠ কেটে নিয়ে যায়, কখনো দু-চারজন হতাহত হয়, সব সময়ই কিছু সংখ্যক ঘর-বাড়ি ভস্মীভূত হয়। কেন সেই সমস্যার কোন সমাধান হয় না? এমন নয় যে সমস্যাটির গুরুত্ব কেউই ঠিক ঠাউরে উঠতে পারছেন না। পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ প্রতিনিয়তই এখানে সেখানে সর্বত্র ফেটে পড়ছে। উপজাতিদের মেজাজ যত তিরিক্ষি হচ্ছে, এই বিস্ফোরণের আকার-প্রকারও ততই ভয়াবহ হয়ে উঠছে দিন দিন এর পরে এই বিস্ফোরণগুলির মধ্যে একান্তই আকস্মিকভাবে অথব অন্যথা, যে কোনদিন যোগাযোগ ঘটে যেতে পরে। আর তা হলেই লঙ্কাকাণ্ড। এই সহজ অঙ্কটা যে বুঝতে না পারে সে এখনে মাতৃগর্ভে। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে হলফ কে কিছু বলা বড় শক্ত, কিন্তু আমাদের ঐতিহ্যবাহী আমলাতন্ত্র কখনো অতটা নির্বোধ হতে পারে না।

সমস্যাটির তবুও কোন সমাধান হয়নি, কারণ সরকারী ফাইলে তার কোন রকম পথনির্দেশ নেই। সরকারী ফাইলে এই সমস্যা যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায় তা অসম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ বলেই বিকৃত সৈন্য পাঠালে, নতুন নতুন পুলিশ ফাঁড়ি খুললে এবং যুক্ত-বিবৃ দিলে ফাইলে সমস্যাটি সাময়িকভাবে ধামাচাপা পড়ে। কি

আনব সমস্যাটি আরও জটিল হয়—যেমন হয়ে আসছে গত ত্রিশ বছর ধরে।

আসামের এই সীমানা সমস্যার স্বরূপটি বুঝতে হলে সরকারী ফাইল থেকে মুখ তুলে একটু পিছন দিকে তাকাতে হবে। কেন না, এই সমস্যার যখন সূচনা তখনো পর্যন্ত এদেশে ব্রিটিশরা আসেনি, আমলাতন্ত্র চালু হয়নি, ফাইলের প্রাদুর্ভাব ঘটেনি। সম্ভবত ঐতিহাসিক কালের আগে থাকতেই ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব এই দুই সীমানা অতিক্রম করে এদেশে লোক আসতে শুরু করে। যুগ যুগ ধরে দলে দলে এরা আসতেই থাকে।

ব্রিটিশরা এসে পৌছবার আগে পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব সীমানা অঞ্চলের কোন মানচিত্রই ছিল না। দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা—কিন্তু মোগল যুগ পর্যন্ত দিল্লি এদিকে হাত বাড়াতে সাহস পায়নি। বিরূপ প্রকৃতি তার মাত্র একটি কারণ, অন্যতম কারণ নয়। ব্রিটিশরা এসে বিশ্বাসঘাকতা করবার আগে পর্যন্ত এই এলাকা সম্পূর্ণরূপে উপজাতিদের দখলে ছিল। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আগত, সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে উন্নীত, ভিন্ন ভিন্ন সব উপজাতি। ছোট বড় অনেক রাজা ছিলেন, ছোট বড় অনেক রাজত্ব ছিল। রাজার মৃত্যু অথবা চরিত্র উপলক্ষ করে ক্রমাগতই রাজত্বের সীমানা পালটে যেত। এর মধ্যেই আবার পাহাড় ডিঙিয়ে, অরণ্য অতিক্রম করে নতুন নতুন দল এসে পৌছচ্ছে। জায়গা না ছাড়লে তারা জায়গা দখল করে নেয়। হানাহানি হয় আবার একদিন তা থেমেও যায়। ইতিহাসের স্বভাব-ধীর গতিতে এমনি ধারাই চলছিল—চলতে চলতে এরাও নিশ্চয়ই একদিন এক দেহে লীন হয়ে যেত। কিন্তু বাদ সাধল ব্রিটিশরা এসে।

প্রাক-ব্রিটিশ যুগে এই এলাকার সবচাইতে প্রভাবশালী ও প্রতাপশালী রাজ্য ছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অহোম রাজ্য। এই

মনে রাখা দরকার: আসামের এই সীমানা সমস্যা কেবল নাগাল্যাণ্ডের সীমানাতেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রায় সব কয়টি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সঙ্গেই আসামের সীমানা বিরোধ রয়েছে—মিজোরাম, মেঘালয়, অরুণাচল কেউ বাদ পড়েনি। সময়ে ভুটানের সঙ্গেও সীমানা বিরোধের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। বাদ কেবল ত্রিপুরা আর বাংলাদেশ—কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে।

মিজোরাম, মেঘালয়, অরুণাচল সীমানায়ও প্রত্যেক ঋতুতেই গোলমাল হয়। কখনো এই এলাকার লোক ওই এলাকার ধান কেটে আনে, কখনো ওই এলাকার লোক এসে এই এলাকার কাঠ কেটে নিয়ে যায়, কখনো দু-চারজন হতাহত হয়, সব সময়ই কিছু সংখ্যক ঘর-বাড়ি ভস্মীভূত হয়। কেন সেই সমস্যার কোন সমাধান হয় না? এমন নয় যে সমস্যাটির গুরুত্ব কেউই ঠিক ঠাউরে উঠতে পারছেন না। পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ প্রতিনিয়তই এখানে সেখানে সর্বত্র ফেটে পড়ছে। উপজাতিদের মেজাজ যত তিরিক্ষি হচ্ছে, এই বিস্ফোরণের আকার-প্রকারও ততই ভয়াবহ হয়ে উঠছে দিন দিন। এর পরে এই বিস্ফোরণগুলির মধ্যে একান্তই আকস্মিকভাবে অথবা অন্যথা, যে কোনদিন যোগাযোগ ঘটে যেতে পরে। আর তা হলেই লঙ্কাকাণ্ড। এই সহজ অঙ্কটা যে বুঝতে না পারে সে এখনো মাতৃগর্ভে। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে হলফ করে কিছু বলা বড় শক্ত, কিন্তু আমাদের ঐতিহ্যবাহী আমলাতন্ত্র কখনোই অতটা নির্বোধ হতে পারে না।

সমস্যাটির তবুও কোন সমাধান হয়নি, কারণ সরকারী ফাইলে তার কোন রকম পথনির্দেশ নেই। সরকারী ফাইলে এই সমস্যার যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায় তা অসম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ বলেই বিকৃত। সৈন্য পাঠালে, নতুন নতুন পুলিশ ফাঁড়ি খুললে এবং যুক্ত-বিবৃতি দিলে ফাইলে সমস্যাটি সাময়িকভাবে ধামাচাপা পড়ে। কিন্তু

আসল সমস্যাটি আরও জটিল হয়—যেমন হয়ে আসছে গত ত্রিশ বছর ধরে।

আসামের এই সীমানা সমস্যার স্বরূপটি বুঝতে হলে সরকারী ফাইল থেকে মুখ তুলে একটু পিছন দিকে তাকাতে হবে। কেন না, এই সমস্যার যখন সূচনা তখনো পর্যন্ত এদেশে ব্রিটিশরা আসেনি, আমলাতন্ত্র চালু হয়নি, ফাইলের প্রাচুর্ভাব ঘটেনি। সম্ভবত ঐতিহাসিক কালের আগে থাকতেই ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব এই দুই সীমানা অতিক্রম করে এদেশে লোক আসতে শুরু করে। যুগ যুগ ধরে দলে দলে এরা আসতেই থাকে।

ব্রিটিশরা এসে পৌছবার আগে পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব সীমানা অঞ্চলের কোন মানচিত্রই ছিল না। দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা—কিন্তু মোগল যুগ পর্যন্ত দিল্লি এদিকে হাত বাড়াতে সাহস পায়নি। বিরূপ প্রকৃতি তার মাত্র একটি কারণ, অন্যতম কারণ নয়। ব্রিটিশরা এসে বিশ্বাসঘাকতা করবার আগে পর্যন্ত এই এলাকা সম্পূর্ণরূপে উপজাতিদের দখলে ছিল। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আগত, সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে উন্নীত, ভিন্ন ভিন্ন সব উপজাতি। ছোট বড় অনেক রাজা ছিলেন, ছোট বড় অনেক রাজত্ব ছিল। রাজার মৃত্যু অথবা চরিত্র উপলক্ষ করে ক্রমাগতই রাজত্বের সীমানা পালটে যেত। এর মধ্যেই আবার পাহাড় ডিঙিয়ে, অরণ্য অতিক্রম করে নতুন নতুন দল এসে পৌছচ্ছে। জায়গা না ছাড়লে তারা জায়গা দখল করে নেয়। হানাহানি হয় আবার একদিন তা থেমেও যায়। ইতিহাসের স্বভাব-ধীর গতিতে এমনি ধারাই চলছিল—চলতে চলতে এরাও নিশ্চয়ই একদিন এক দেহে লীন হয়ে যেত। কিন্তু বাদ সাধল ব্রিটিশরা এসে।

প্রাক-ব্রিটিশ যুগে এই এলাকার সবচাইতে প্রভাবশালী ও প্রতাপশালী রাজ্য ছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অহোম রাজ্য। এই

রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা সব দিক থেকেই ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক প্রশাসনের চাইতে অনেক অনেক উঁচু স্তরের ছিল। (একটা উৎকৃষ্ট প্রশাসনকে হটিয়ে দিয়ে সেখানে একটা নিকৃষ্ট প্রশাসন বসাবার ব্যাপারে তৎকালীন বাঙালী বাবুরা ব্রিটিশদের প্রভূত সহায় হয়েছিল। আসামে বাঙালী বিদ্বেষের এইটে একটা আদি কারণ।) ব্রিটিশরা এসে প্রথম আসাম রাজ্যের দখল নিল। তারপরে একে একে যখন যে রাজ্য বা যে এলাকা হাতে এল তা আসামের সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হল। এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তখন বিশেষ কিছু চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন ছিল না। ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী এক ভারতবর্ষ গড়ে তোলা ব্রিটিশদের মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না। তবে ওরা বাণিজ্য বুঝত, আর সেই বাণিজ্য কেমন করে সুরক্ষিত রাখতে হয় তাও জানত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মূল্য ওরা ভালই জানতো। তার বাইরের অজস্র উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা ঠাণ্ডা থাকলেই হল। এদের উপর কেবল সতর্ক নজর রাখলেই হল—যাতে কোন দুষ্টামি না করে বসে—আর চুষিকাঠি হিসাবে এদের মুখে একবার ক্রিশ্চিয়ানিটি গুঁজে দিতে পারলেই কেল্লা নিরাপদ। প্রশাসনকে অযথা আরও ভারগ্রস্ত না করে স্রেফ ভ্রুকুটি দিয়েই এ-কাজটা কত সহজে ফতে করা যায়, ঝানু ঔপনিবেশিকদের তা অজানা ছিল না। আসামের মানচিত্রের মধ্যে জেলা অথবা অন্য নামে এদের যদি জুড়ে দেওয়া যায়, তবে এরা নজরের বাইরে যেতে পারবে না, অপরদিকে অলঙ্ঘনীয় পলিসি রইল যে কোন ব্যাপারেই—কেবল শান্তি রক্ষার অপরিহার্য কর্তব্যটুকু ছাড়া—কখনোই এদের কেশাগ্রটুকুও ছোঁয়া চলবে না।

তারপর ১৯৪৭ সনে হঠাৎ ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে গেল। মানচিত্রে ভারতবর্ষের রং বদলাল। ব্রিটিশরা ভেঁপু বাজিয়ে দেশে চলে গেল; দেশটা কিন্তু যে-আমলাদের হাতে ছিল সেই আমলাদের হাতে

রইল, আর এদের উপর খবরদারি করবার জন্য যেসব অনারেবল ব্যক্তিরা এলেন গোড়া থেকেই তাদের অন্য ধান্দা ছিল। এমতাবস্থায় আমলারা যদি স্বতই ধরে নিয়ে থাকেন যে ঔপনিবেশিক আমলে দেশ যেমনভাবে চলছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও দেশ তেমনিভাবেই চলবে, তবে তাদের খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না।

বিষয়টিকে তলিয়ে দেখতে হবে উপজাতিদের দিক থেকে—যারা দুর্বল, যারা সংখ্যাল্প, যারা অজ্ঞ, যারা বিচ্ছিন্ন বিভক্ত আর সমতল-বাসীদের সম্পর্কে যাদের মনে আছে সহজাত ভীতি ও সন্দেহ। দিল্লিতে যতদিন সাহেবরা ছিলেন ততদিন এরা নিশ্চিন্ত ছিল—ব্রিটিশরা আর যাই করুক উপজাতিদের অন্তত জাতে মারবে না। ব্রিটিশদের উপর ইতিহাসের সে রকম কিছু বরাত দেওয়া নেই। নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে ব্রিটিশদের বিষয়কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করলে—ব্রিটিশরা গায়ে পড়ে ঘাঁটাতে আসবে না। যায়ওনি। এই সময়টায় উপজাতিদের নৃতাত্ত্বিক বিবর্তনের কাজটি শিকেয় তোলা ছিল।

ব্রিটিশরা চলে যেতে অবস্থান্তর ঘটল। দিল্লিতে নতুন যারা এল উপজাতিরা তাদের চেনে। অনেকটা জ্ঞাতি ভাইয়ের মতো। ইতিহাসই সম্পর্কটা পাতিয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যতে কোন দিন উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য হবে—হতেই হবে। এই সামঞ্জস্য যতদিন সাধিত না হয় ততদিন কারো রেহাই নেই। ততদিন উভয়ের মধ্যে রেষারেষি চলবেই, সংঘর্ষ ঘটবেই। এই রেষারেষির মধ্যে দিয়েই উভয় উভয়কে চিনবে জানবে বুঝবে—তারপরে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উদ্রেক হলে তখন সামঞ্জস্য। ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের এই চিরায়ত ধারাটি ব্রিটিশ আমলে নিদারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু দিক হারায়নি, হারাবার উপায় নেই। ব্রিটিশরা অপসৃত হতেই ধারাটি আবার ফুঁসে উঠল। পাহাড়ী নদী কোন বড় মাপের প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে যেমন ফুঁসে ওঠে।

ইতিহাসের অত কথা আমাদের জানা ছিল না বলেই হোক,—অথবা ইতিহাসকে ধোঁকা দেব ভেবেই হোক, আমরা এমন ভান করলাম যেন ব্রিটিশদের চলে যাওয়াটা একটা ব্যাপারই নয়। যেন খেলা যেমন চলছিল তেমনিই চলছে, এবং চলতে থাকবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ব্রিটিশদের আঁকা মানচিত্রের উপরই প্রজাতন্ত্র ভারতের সাংবিধানিক শীলমোহর মেরে দেওয়া হল। উপজাতিরা—যার যতটা গলার জোর—আপত্তি জানিয়েছিল। আমরা সে সব কানে তুলিনি। ঘ্যানঘ্যানানি থামাবার জন্য ওদের মুখে সংবিধানের ষষ্ঠ সিডিউলটি চুষিকাঠির মতো ধরিয়ে দিয়ে আমরা ভাবলাম- এরপর খোকারা ঠিক ঘুমিয়ে পড়বে এবং পাড়া জুড়োবে। সমতলবাসীদের সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে যেসব উপজাতিরা কিছুটা কেতা-দুরস্ত হয়েছিল—যেমন খাসিয়া জয়ন্তীয়া, গারো, মিকির, উত্তর-কাছাড়ি ইত্যাদি—ষষ্ঠ সিডিউল'টি পেয়ে ওদের কান্না থেমে গেল। কিন্তু ওরা ঘুমিয়ে পড়ল না; একটু দম নিয়ে তারপর দারুণ হাত ঘোরাতে শুরু করল—নাড়ু পাবার আশায়। ওদের দিকে মাঝে মধ্যে দুটো-একটা বাড়তি নাড়ু ছুঁড়ে দেবার প্রশাসনিক ব্যবস্থা হল।

কিন্তু উপজাতিদের মধ্যে যারা একটু গোঁয়ার এবং বিচ্ছু-প্রবৃত্তির সেই নাগা ও মিজোরা প্রথমটায় চুষিকাঠি মোটে মুখেই নেবে না। জোর করে যখন মুখে গুঁজে দেওয়া হল তখন ওরা নচ্ছারের মতো সেগুলো চিবোতে শুরু করল। কান্না থামল না, কান্নাটা ক্রমে হুংকার হয়ে উঠল। ষষ্ঠ সিডিউলের দরাজ সুযোগ সুবিধেগুলো সত্ত্বেও ওদের ঢ্যাঁটামি যখন থামল না তখন আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে এর পেছনে বিদেশী চক্রান্ত আছে, মিশনারিদের উস্কানি আছে। অভিযোগটা এমনই মারাত্মক যে আমাদের স্পর্শকাতর হিন্দু জাতীয়তাবোধ তৎক্ষণাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল—অভিযোগটির সত্যাসত্য বিচার করবার মানসিক ভারসাম্য আমরা হারিয়ে

ফেললাম। —সেই থেকে নাগাদের যাবতীয় সমস্যাই আমাদের কাছে চক্রান্তমূলক বলে মনে হয়। সমস্যা সমাধানের চাইতে চক্রান্তটি ব্যর্থ করা বেশি জরুরি বলে প্রতীত হয়। তারপরে অতি-নিষ্ঠুর ব্যবস্থা না নিয়ে উপায় থাকে না। তখন উন্নয়নের জন্য দেওয়া টাকাও উৎকোচের মতো দুর্গন্ধময় হয়ে ওঠে। নাগা প্রতিরোধ আরও বেপরোয়া হয়। সমস্যাগুলোতে আরও জট পাকায়। উভয়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও আক্রোশ আরও পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে।

আসাম ও নাগাল্যানডের মধ্যে সীমান্ত সমস্যাটি এই একই পদ্ধতিতে জড়িত হয়েছে, স্থায়িত্ব লাভ করেছে। আমাদের হালচাল কিছুটা দেখে এবং বাকিটা অনুমান করে উগ্র নাগারা প্রথমাবধি ভারতবর্ষ থেকে পৃথক হয়ে যাবার আন্দোলন শুরু করে। মডারেট নেতারা বলেন, নাগা-পাহাড় জেলা আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক একটা রাজ্য করা হোক। একেবারে গোড়াতেই যদি এই মডারেট নেতাদের দাবিটা মেনে নেওয়া হত, পৃথক একটা নাগা-রাজ্য করে দেওয়া যেত, তাহলে নাগা জনসাধারণের সিংহভাগ এই মডারেট নেতাদের সঙ্গেই থাকত—নাগা সমস্যা তাহলে আর হাতছাড়া হতে পেত না। কিন্তু এই মডারেট দাবিটির পিছনেও আমরা গূঢ় ষড়যন্ত্র দেখতে পেলাম—এবং তা ছিন্ন করবার জন্য উপর্যুপরি বারো বছর ধরে হেন দুষ্কর্ম নেই যা করলাম না। তারপরে ১৯৬৩ সনে জওয়াহরলাল নেহরু গিয়ে নাগাল্যাণ্ড রাজ্যের উদ্বোধন করে এলেন!

এর মধ্যেও আবার একটা মারাত্মক ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটল। ব্রিটিশদের আঁকা আসামের মানচিত্র থেকে নাগা পাহাড়কে বিচ্ছিন্ন করে আনা হল্। বিচ্ছিন্ন করা হল ব্রিটিশদেরই আঁকা জেলার সীমারেখা ধরে খুব সন্তর্পণে কাঁচি চালিয়ে। এই সীমারেখা আঁকবার আগে বৃটিশরা নৃতাত্ত্বিক অথবা ওই ধরনের কোন সমীক্ষা চালিয়েছিল বলে কোন খবর নেই। এটুকু জানা আছে যে এই সীমারেখা টানবার

সময় ব্রিটিশদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চা-বাগানগুলোকে হামলামুক্ত রাখা। নাগা পাহাড়কে আসামের ভিতর জেলা হিসাবে দেগে নেবার পরেও সেখানে খবরদারি করতে যাবার কোন বাসনা ব্রিটিশদের ছিল না। কিন্তু সীমান্ত থেকে অন্তত কিছুদূর পর্যন্ত নাগাদের উপর নজর না রাখতে পারলে চা-বাগানের নিরাপত্তা কেমন করে সুনিশ্চিত করা যায়? এমন অবস্থায় ব্রিটিশরা যদি নাগা পাহাড়ের দিকে কিছুটা মেরে সীমারেখা টেনে থাকে তবে সেজন্য ওদের দোষ ধরা যায় না। সেটাই স্বাভাবিক।

আমরা কিন্তু এই সীমারেখাটিকেই চূড়ান্ত ধরে নিয়ে নাগাল্যাণ্ড রাজ্যের নতুন মানচিত্র আঁকলাম। কেন? আসাম থেকে নাগা পাহাড়ের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া যদি ন্যায্য বলে বিবেচিত হয়, তবে সীমানার ওই সামান্য জমিটুকু কি দোষ করল? এমন বলা চলবে না যে ওই এলাকাটুকুতে একটা সমীক্ষা চালাবার বা জনমত যাচাইয়ের সময় ছিল না—আমরা বারো বছরের উর্ধ্বকাল ওই আগুন নিয়ে খেলেছি। তবে? এই প্রসঙ্গে আইনের কথা তোলা হাস্যকর হবে। আইন মানে তো ব্রিটিশদের তৈরি আইন—যা অমান্য করে আমরা স্বাধীন হয়েছি বলে দাবি করে থাকি। ১৯২৫ সনের একটা ঔপনিবেশিক দলিল দেখিয়ে আমরা যদি নাগাদের নিরস্ত থাকতে বলি তবে তা আমাদেরই লজ্জা আমাদেরই পরাজয়। আসাম সরকার ঠিক তাই করে চলেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ঠেকা মেরে যাচ্ছেন।

সমস্যাটিকে যুগ যুগ ধরে সক্রিয় রাখবার কৃতিত্ব অনেকটাই আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের। অতিপ্রাচীন একটি সমস্যা ব্রিটিশদের ঠাণ্ডা-গরমে ভুমড়ে মুচড়ে অবশেষে প্রজাতন্ত্র ভারতের স্নেহচ্ছায়ায় এসে জুটল। নেতারাও কালবিলম্ব করলেন না। ভারতীয় রাজনীতির যত কিছু বৈশিষ্ট্য—সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা,

ভণ্ডামি, পরের কাঁধে বন্দুক রাখা ও মাথায় কাঁঠাল ভাঙা, কথায় বাজিমাৎ করা, চোখ-কান বুঁজে অন্যের উপর দোষ, সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া এবং এই ধরনের আরও অজস্র গুণাবলী খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। শূন্যগর্ভ দেশপ্রেম অকারণেও চলকে ওঠে—বিতর্কিত এলাকায় গাছের পাতাটি নড়লে আমাদের নির্বাচিত নেতারা যুগপৎ রে-রে-রে-রে এবং গেল-গেল বলে ডুকরে ওঠেন। বিরোধীপক্ষ সরকারের মুণ্ডপাত করে। সরকার পক্ষ সব দোষ প্রতিবেশী রাজ্যের উপর চাপিয়ে দেয়। প্রতিবেশী রাজ্যেও ঠিক তেমন তেমন ঘটে।

গলদটা একেবারে গোড়ায়। প্রচুর ইমাজিনেশন এবং বোলড্‌নেস ছাড়া আসামের সীমান্ত সমস্যা সমাধান হতে পারে না, এবং ওই দুটি গুণ কোন দেশের কোন আমলা-তন্ত্রেরই নেই। এরা সমস্যার মোকাবিলা করতে জানেন, সমাধান করতে জানেন না। জানলেও সে-বিদ্যা এরা প্রয়োগ করবেন কেন? সমস্যা আছে বলেই এদের চাকরি আছে, সমস্যার সংখ্যা বাড়লে এদের চাকরির ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হয়। একটা সমস্যা শেষ হলে যদি সেখানে দশটা নতুন সমস্যা গজিয়ে ওঠে তবে ওরা সে কাজে আছে।

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষও এই সীমান্ত সমস্যাগুলোকে খুব স্নেহের চক্ষেই দেখে থাকেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খুচরো রাজ্যগুলি এই সব রেষারেষি নিয়ে যতদিন মেতে থাকে ততদিনই ভালো। খণ্ড ছিন্ন দুর্বল বিভক্ত ভূখণ্ডের উপর খবরদারি করে যে আরাম এবং মুনাফা তেমন আর কিছুতে নয়। এই রাজ্যগুলি যে নিছক দৈনন্দিন বিচারেই পরস্পরের পরিপূরক সেই সহজ সত্যটা ঢেকে রাখবার সহজতম উপায় হলো এই অন্তর্কলহ। এরা সংঘবদ্ধ হলে দিল্‌লির বিপদ আছে। কিন্তু লড়াইগুলো যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়।

আগুনটিকে নিভিয়ে দেব না, আবার দপ করে জ্বলে উঠতেও দেব না—এত কঠিন কাজ কেবল কোন অবসর-প্রাপ্ত আই-সি-এস অফিসার দ্বারাই সম্ভব।

এতদঞ্চলের যাবতীয় রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলোর জন্য—কুল্লে সাতটি—মাত্র একজনই রাজ্যপাল, এবং অনেকদিন থেকেই তিনি একজন অবসর প্রাপ্ত আই-সি-এস। এই এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে অজস্র কমিটি-কমিশন গঠিত হয়েছে—প্রত্যেকটিরই মাথায় একজন করে অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ অফিসার। সমস্যাগুলি সমাধানের বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও যে কেন্দ্রীয় সরকারের নেই তার নির্লজ্জ প্রমাণ এই কর্তা নির্বাচন। যে সমস্যাগুলো সম্পূর্ণরূপে আঞ্চলিক ও মানবিক সেগুলোর উপর সালিশী করবার জন্য বাইরে থেকে এমন লোক টেনে আনা হল যার এই এলাকা সম্পর্কে, এই এলাকার অধিবাসীদের সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই, কোন কৌতূহলও না, শ্রদ্ধা বা সমবেদনা তো নয়ই। আসাম-নাগাল্যাণ্ড সীমান্ত সমস্যার সমাধানকল্পে সুন্দরম কমিশন নিয়োজিত হয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে এই কমিশন কি করেছেন বা করেননি তা জানি না, জানবার কৌতূহলও নেই। সমস্যাটি যে রয়ে গেছে তা তো কিছুদিন আগেই প্রমাণ হয়ে গেল।

কেবল নাগাল্যাণ্ড নয়, আসামের সঙ্গে সীমানা বিরোধ রয়েছে মিজোরামের মেঘালয়ের এবং অরুণাচলের। কোন ক্ষতটি থেকে ঘন ঘন রক্তক্ষরণ হয়, কোনটি থেকে মাঝে মাঝে—রোগ কোথায়ও একটু বেশি দূর গড়িয়েছে কোথায়ও একটু কম দূর—এবং এগুলো নিয়ে একই পদ্ধতির ঘাঁটাঘাঁটি চলেছে। ব্রিটিশদের আঁকা মানচিত্র নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করে, ব্রিটিশদের চাপানো সন্ধিপত্র নিয়ে বাদ-বিতণ্ডা তুলে এ-সমস্যার সমাধান হবে না।

তাহলে এই সমস্যার সমাধান কোথায়? জানি না। শুধু

এইটুকু নিশ্চিতরূপে জানি যে সমস্যা যতই জটিল অথবা দুরূহ হোক সেটিকে সঠিকরূপে ও সম্যকরূপে বুঝতে পারলে তখন আর তার সমাধানের জন্য দেয়ালে মাথা কুটতে হয় না! সব সমস্যারই সমাধান আছে, চাই শুধু একটু উদারতা, একটু সমবেদনা এবং একটু বলিষ্ঠতা। চাই পরস্পরের প্রতি একটু শ্রদ্ধা এবং একটু আস্থা। আমলাতন্ত্রের থলিতে এসব জিনিসের খোঁজ পাওয়া যাবে না। দিল্লী থেকে এ-ব্যাপারে কোন রকম সাহায্য পাবার কোন আশা নেই। দিল্লী অনেক দূরে তো, ওখান থেকে কেবল আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারটুকুই চোখে পড়ে।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য এই অঞ্চলের লোকদেরই যত্নবান হতে হবে। দুর্গম ব্যাপার কিন্তু নাস্তি গতিরন্যথা।

আসাম থেকে আবারও গণ্ডগোলের খবর এসে পৌঁছতে শুরু করেছে। আসামের এই গণ্ডগোলটা, বাতের ব্যাথার মতো, সারা বছরই লেগে থাকে—কেবল একাদশী পূর্ণিমায় একটু চাড়া দেয়। উত্তাপ বাড়লে তখন আপনা থেকেই তার খবর এ রাজ্যে এসে পৌঁছতে শুরু করে।

বিবিধ কারণে আসামের এই ক্রনিক গণ্ডগোলের খবর আজকাল আর কলকাতার দৈনিকগুলিতে ছাপা হয় না। হঠাৎ কখনো দুই অথবা তিনের পাতায় ছোট্ট একটু খবর বেরোয়—ডিব্রুগড়ে ১৪৪ ধারা, কিংবা ধুবড়িতে কার্ফু, কিংবা মঙ্গলদৈতে সি-আর-পি তলব। ওই থেকে যে যেটুকু পার বুঝে নাও। অথচ কিছু দিন আগেও, এই ষাটের দশকের শেষের দিকেও, এই সব সংবাদপত্র খুব ফলাও করে ব্যানার হেড-লাইনে এই গণ্ডগোলের খবর পরিবেশন করত—তখন কত রোমহর্ষক ছবি আর কত রুদ্ধশ্বাস প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, কত উষ্মা আর কত অশ্রুজল! আর তারপরেই হঠাৎ এই মৌনব্রত। কি কি কারণে এই মৌনব্রত, কাগজগুলি তা নিজ নিজ পাঠকবর্গকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি।

এই গণ্ডগোলের খবর যখন কাগজে ছাপানো হত তখন এর পুরো দায়িত্বটাই নির্বিবাদে খবরের কাগজের উপর চাপিয়ে দেওয়া হত—ওদের লেখা পড়ে লোকেরা উত্তেজিত হয়, গোলমাল আরও ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগটা একেবারেই অসত্য এমন কথা বলা চলবে না। সমস্যাটির স্বরূপ নির্ধারণ করবার কিছুমাত্র চেষ্টা নেই, এর কোন সমাধান আছে কি না সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র উদ্বেগও নেই,

মাঝখান থেকে হঠাৎ কতকগুলি মার-ধোর আর অগ্নিকাণ্ডের খবর পড়লে মানুষ একটু উত্তেজিত হবেই।

তবুও, একথা ঠিক নয় যে খবরের কাগজগুলির জন্যই গোলমাল বাধে ও ছড়ায়। কলকাতার কাগজ পড়ে 'আসামের বাঙালীরা যদি সংঘবদ্ধ হয়ে কোনদিন অত্যাচারের প্রতিরোধ করত তবেও না' হয় একটা কথা ছিল; কিন্তু এমন অসম্ভব কাণ্ড আজও সম্ভব হয়নি। দশকের পর দশক ধরে কেমন করে নিঃশব্দে মার খেতে হয় আসামের বাঙালীদের এখন তা মজ্জাগত হয়ে গেছে। এমন একতরফা সাম্প্রদায়িক গোলমাল অন্য কোন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ভাবাই যায় না। গৌহাটিতে একবার কয়েকটা মাড়োয়ারি দোকানের উপর হামলা হয়েছিল—তার হ্যাপা সামলাবার জন্য দিল্লী থেকে স্বয়ং হোম মিনিস্টারকে ছুটে আসতে হয়। বাঙালীদের নিয়ে সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত। আগে কাগজগুলি অর্থহীন মরাকান্না জুড়ে দিত, এখন তাও জুড়িয়েছে।

আসল কথা এই যে, আসামের বাঙালীরা একটা মৌলিক সমস্যা। এই সমস্যা ছিল, আছে, থাকবে এবং আরো জটিল হবে। কেন্দ্রীয় সরকার সমস্যাটিকে আদৌ পাত্তাই দেয় না, নয়তো এটিকে একটি জাতীয় সমস্যা বলে চিহ্নিত করবার সবরকম যুক্তি আছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবছর এই সমস্যায় বিপর্যস্ত হচ্ছে; একই ভূখণ্ডের মধ্যে আটকে পড়া দুটো বৃহৎ জনসম্প্রদায় থেকে থেকে উত্তাল হয়ে ওঠে আর ভারতের পবিত্র সংবিধানটি ধুলায় গড়াগড়ি যায়; জাতীয় কারণেই এই সমস্যার উৎপত্তি, ব্যাপ্তি ও স্থায়িত্ব; জাতীয় সংহতির মহান আইডিয়াটি একটা অশ্লীল ও নিষ্ঠুর রসিকতায় রূপান্তরিত হল। এই বিরোধ চলতে থাকলে একদিন অবশ্যই এমন অবস্থা দাঁড়াবে [illegible] দিল্লীও তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বেই—কিন্তু সমস্যাটিকে [illegible] পর্যন্ত জাতীয় সমস্যা বলে চিহ্নিত করা

হোল না। এই কপট নির্লিপ্ততার মূল্য একদিন সুদে মূলে শোধ করতেই হবে।

সমস্যাটি সমাধান করবার বা সামাল দেবার কর্তৃত্ব অতএব এককভাবে আসাম সরকারের উপরই ন্যস্ত আছে। আসামের আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য বাইরে থেকে কেউ খবরদারি করতে আসবে এইটে নিশ্চয়ই একটা সম্মানজনক প্রস্তাব নয়। কিন্তু মুশকিল এই যে, আসাম এই বিরোধের অন্যতম শরিকও বটে। অতএব আসামের পক্ষে এ-ব্যাপারে কতদূর নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। এমনকি আসাম যদি নিরপেক্ষ হয়ও তবুও অপরপক্ষ তা স্বীকার নাও করতে পারে। অপরদিকে, আসাম যে এই সমস্যার কোন সমাধান করতে পারেনি, এমনকি গোলমাল-টাকেও সামাল দিতে পারেনি, তার প্রমাণ তো প্রতিবছরই হাড়ে হাড়ে পাওয়া যাচ্ছে। সমাধান তো দূরের কথা, কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও আসাম সরকারের তত্ত্বাবধানে গত ত্রিশ বছর ধরে সমস্যাটি এমনই জটিল হয়ে উঠেছে যে এর আর কোন সমাধান হতে পারে বলেই ভরসা হয় না।

কোন সমস্যা স্থায়ী হলেই তাকে ঘিরে নানা রকমের পরস্পর-বিরোধী কায়েমী স্বার্থ গজিয়ে ওঠে। এইসব কায়েমী স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে আসল সমস্যাটাই ক্রমে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। এদেশের নাগা-সমস্যা, বেকার সমস্যা, অথবা শরণার্থী সমস্যা নিয়ে যেমন যেমন হয়েছে আসামের বাঙালী সমস্যা নিয়েও ঠিক তেমন তেমন হয়েছে—উপসর্গগুলির আড়ালে আসল রোগটা চাপা পড়েছে। আসামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এমনকি সামাজিক জীবনের উপরও যে এই উপসর্গগুলি দারুণভাবে বিস্তার করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। হাতের কাছেই এমন পরিপাটি একটা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ—যে বিদ্বেষকে প্রয়োজন মতো ক্ষেপিয়ে তোলা যায়—বর্তমান

ডামাডোলের বাজারে এমন পোষমানা একটা বিদ্বেষ অনেকেরই কাজে লাগে। আসামও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকেনি। কিন্তু সেজন্য আসামকে দোষী সাব্যস্ত করা ঘোরতর অন্যায় হবে—কেননা, এমন অবস্থায় অন্য যে কোন রাজ্যেও একই ঘটনা ঘটত।

আসামের বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাষা আন্দোলনের পুরোভাগে আত্মপ্রকাশ করেন। বাঙালী বিরোধী আন্দোলনের একসময় পোশাকী নাম ছিল—ভাষা আন্দোলন। সেই অনভিপ্রেত জনসমষ্টির হাত থেকে আসামকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এরা নির্বাচন বৈতরণী অতিক্রম করেছিলেন। সেই অনভিপ্রেত জনসমষ্টি কিন্তু এখনো আসামেই আছে, সংখ্যায় বাড়ছে এবং নিত্য নতুন ঝঞ্ঝাট করছে। তা করুক, সেই সব রাজনৈতিক নেতারা কিন্তু তন্মধ্যেই প্রভূত বিত্তশালী ও সম-পরিমান প্রতিপত্তি-শালী হয়ে উঠেছেন। ভবিষ্যতে এদের কারো কারো ছবি আসাম বিধানসভার লবি অলংকৃত করবে।

আসামের বাঙালী বিধায়ক বাবুরা আরো এক ডিগ্রি সরেস। বাঙালী সমাজের উপর নির্যাতনটা যখনই একটু চরমে ওঠে তখনই এরা দুজন একজন করে আবির্ভূত হন। কথায় বাঙালীর সঙ্গে পারবে কে? এরা আবার বাঙালীরও নেতা হবেন বলে কোমর বেঁধেছেন—দিল্লীকে চেতিয়ে তুলব, আসামের দফারফা করব, বাঙালী আবার তার পূর্ব-বৈভবে অধিষ্ঠিত হবে—কেবল ভোটটা আমাকে দিও আর সেই সঙ্গে চাঁদা করে নির্বাচনের খরচটা। বাকি সব কিছু রিলিফ ফাণ্ডের টাকায় সামলে নেওয়া যাবে। তবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এরা স্থায়ী হবার সুযোগ পান না। ক্ষুধার্ত মানুষের সামনে হঠাৎ প্রচুর ভোজ্যবস্তু হাজির করলে যেমন হয়, এরা বিধানসভায় গিয়ে একের পর এক এমন সব কেলোর কীর্তি করেন যে পরবর্তী নির্বাচনেই বাঙালীদের আবার নতুন করে নেতা তল্লাশ করতে হয়।

এরা তখন যাদের ধ্বংস করবে বলে বেরিয়েছিলেন তাদেরকেই আশ্রয় করে হাওয়া গাড়ি চড়ে বেড়ান।

বাঙালী ও অসমিয়া নির্বিশেষে, এই সব রাজনৈতিক নেতাদের কাছে এই গোলমালটি খুব মুল্যবান বস্তু। এই গোলমালটি মিটিয়ে ফেলা তাদের পক্ষে লাভজনক নয়। ঘুঁটিয়ে তুললেই বরং বাড়তি মুনাফা। আসামের রাজনৈতিক চেহারা যতদিন অপরিবর্তিত থাকবে, ততদিন আসামের বাঙালী সমস্যার কোন সমাধান হতে পারে না।

বিরোধটির আরও নানা রকম ব্যবহার আছে। কোন ভ্রাতৃসম নেতাকে কায়দা করতে হবে? কোন মন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে? বেকার সমস্যা নিয়ে যুবকরা যাতে ক্ষিপ্ত না হয়ে ওঠে সেজন্য প্রতিষেধক দরকার? দ্রব্যমূল্য নিয়ে যাতে কোন প্রতিরোধ আন্দোলন দানা বাঁধতে না পারে অথবা দুর্নিতির যে অভিযোগ উঠেছে সেটি চাপা দিতে হবে? এইসব এবং আরো অজস্র সমস্যার একমাত্র সমাধান—বিরোধটাকে চাগিয়ে দাও।

স্বাধীনতার আগে থেকেই শুরু হয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতার পর গত ত্রিশ বছর ধরে বিরোধটিকে তো বহুবার বাঁচিয়ে তোলা হল কিন্তু আসামের বাঙালী জনসংখ্যা তাতে একজনও কমেনি। কমেনি, কেননা কমতে পারে না। এরা যাবে কোথায়? পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই পায়নি বলেই এরা আসামেই এসে শেষ আশ্রয় নিয়েছে, মরতে হলে আসামেই মরতে হবে। বিরোধটাকে জিইয়ে রেখে অন্য কোন ব্যাপারেও আসামের কোন লাভ হয়নি।

অসহনশীলতা জিনিসটা বড় ছোঁয়াচে। এইটে একবার চরিত্রে ঢুকে গেলে মানুষ তখন সকলের প্রতি অসহনশীল হয়ে ওঠে। উপজাতি সমস্যা নিয়ে আসামকে যে বারবার অবমানিত হতে হয়েছে, তার কারণ এই সহনশীলতার অভাব। অসমীয়া সমাজ এর ফলে দিন দিন আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। বিদ্বেষ মানুষকে অন্ধ করে।

পরিণামের কথা চিন্তা না করে আসামও একটা বিপজ্জনক কেলেঙ্কারী করে বসে আছে। গত ত্রিশ বছর ধরে বাংলাদেশ থেকে ঠিক কত লক্ষ অনুপ্রবেশকারী আসামের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছে তার নির্ভরযোগ্য কোন হিসাব নেই—বাংলাদেশী চাষীরা খায় কম, খাটে বেশী, আর একদম রাজনীতি করে না। কিন্তু এর ফলে আসামের জনসংখ্যার ভারসাম্য দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। এর ঝক্কিও একদিন আসামকেই পোহাতে হবে।

সাধারণভাবে একথা বলা চলে যে, সমস্যাটির উদ্ভব ও প্রসার দুটোই ঘটে মুখ্যত ঐতিহাসিক কারণে। কলকাতাকে মূলঘাঁটি করে ব্রিটিশরা উত্তর ও পূর্ব-ভারতে উপনিবেশ বিস্তার করেছিল। উপনিবেশ চালাবার মতো কেরানি তৈরির সুবৃহৎ কারখানাটিও কলকাতায়ই স্থাপিত হয়। এরপর ভারত ভূখণ্ডে ব্রিটিশ উপনিবেশের সীমা যত বাড়তে লাগল বাঙালী কেরানিবাবুরাও তল্পিতল্পা নিয়ে ততই ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলেন—বিহারে, ওড়িশায়, উত্তর প্রদেশ এবং অবশ্যই আসামে। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের প্রভুদের সঙ্গে উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, দালাল, মোসাহেব ইত্যাদিরাও এলেন। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা জুড়ে বাঙালীর সে এক বৈভবময় মুহূর্ত। অপরের বকলমে যারা শাসন চালায় তাদের দাপট একটু বেশি হয়ই। তাদের প্রতি স্থানীয় লোকের ক্ষোভটাও ঈর্ষা ও ঘৃণার ফোড়নে খুব ঝাঁঝালো হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে সম্প্রতি যখন ভারতীয় তল্পিবাহকদের নিষ্করুণভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তখন আমাদের খুব অভিমান হয়েছিল—এশিয়দের সম্পর্কে এরা এমন অসহনশীল কেন? ক্ষোভটা আসলে গত কালের—ষোলকলা পূর্ণ হবার পর এখন একে একে ফেটে পড়ছে। আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে এই তল্পিবাহকেরা ছিল মুখ্যত সিন্ধি ও গুজরাটি—সেই একই ভৌগোলিক যুক্তিতে—বিহারে, ওড়িশায়, আসামে এরা বাঙালী।

স্বাধীনতার পরে বিহারে এবং ওড়িশায়ও বাঙালীদের নিয়ে

মাঝে মাঝে হাঙ্গামা বেধেছে—এবং তাই নিয়ে বাঙালীদের মনেও বিস্তর অভিমান আছে। বাঙালীর কপাল ভালো যে ঘনবসতিপূর্ণ বিহারে ও ওড়িশায় এরা খুব একটা শিকড় ছড়িয়ে বসবার সুযোগ পায়নি। এসব জায়গায় বাঙালীদের ওপর পরবর্তী কালের প্রত্যাঘাতটাও তাই অল্পের উপর দিয়েই কেটে গেছে।

বিহার ওড়িশার মতো আসামের বাঙালী সমস্যাটি কিন্তু অত সহজে মিটল না। তারও ঐতিহাসিক কারণ আছে। ব্রিটিশদের হয়ে হাতে কলমে উপনিবেশ স্থাপন করতে এসে বাঙালীবাবুদের অনেকেই পাকাপাকিভাবে আসামে থেকে গেলেন। এর অনেক কারণ ছিল। ব্রিটিশ আমলেই আসাম সর্বপ্রথম প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শিকার হয়—এর আগে মোগল-পাঠানেরাও কোনদিন আসামকে পুরোপুরি কায়দা করতে পারেনি। ব্রিটিশদের দয়ায় পয়সা রোজগারের নানা পথ খুলে গিয়েছিল। কিন্তু আসামে তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হয়নি—বাঙালীরা যাকে বলে ওয়াক-ওভার পেয়ে গেল। আসামের ছোট-বড় শহরগুলিতে সেই থেকেই বাঙালীর একাধিপত্য। চা-বাগানের বাঙালীবাবুদের উৎসাহে ও উদ্যমে বাঙালীর প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও প্রসার লাভ করে।

তবে বাঙালীরা কেবল শোষণ চালিয়ে যাবার জন্যই আসামে রয়ে গেল—এমন কথা বলা ঠিক হবে না। অন্যান্য আকর্ষণও ছিল। বাংলাদেশের সঙ্গে আসামের ভূ-প্রকৃতির মিল একটা অন্যতম আকর্ষণ। তাছাড়া, ভাষা নিয়ে পরবর্তীকালে যতই হত্যাকাণ্ড-অগ্নিকাণ্ড হয়ে থাকুক, অসমীয়া ও বাংলা ভাষার জ্ঞাতিত্ব তাতে মিথ্যা হয়ে যায়নি। একটু আস্তে কথা বললে একজন বাঙালী ও একজন অসমীয়া ভদ্রলোক আজও অনায়াসে বাক্যালাপ চালিয়ে যেতে পারেন। আসল কথা হোল, আসামকে বাঙালীর কখনো পরদেশ বলে মনে হয়নি। আসামের উন্নতিকল্পে এরা যত কিছু করেছেন আজ আর তার কানাকড়িও মূল্য নেই—বাঙালী বংশোদ্ভবেরা

আজ আর তা দাবিও করে না। তবুও নিজেদের কল্যাণের জন্যই অসমীয়াদের তা মনে রাখা উচিত। অকৃতজ্ঞতা জিনিসটা সকলের পক্ষেই খারাপ।

ব্রিটিশরা আরও একটা প্যাঁচ কষে দিয়েছিল। গোয়ালপাড়া জেলার কথা তুলে আজ আর জল ঘোলা করে কোন লাভ নেই, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বাঙালী অধ্যুষিত সিলেট জেলাকে আসামের মানচিত্রে ঢুকিয়ে দিয়ে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করা হয় তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হয়েছে। এই ব্যভিচারের তৎসাময়িক কোন ঔপনিবেশিক যুক্তি নিশ্চয়ই ছিল—কিন্তু অন্য কোন যুক্তি ছিল না, প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কোন যুক্তিই নয়। অথচ তাজ্জবের কথা এই যে খোদ সিলেটও তখনও এই নিয়ে তেমন বলিষ্ঠ কোন প্রতিবাদ করেনি। এর ফলে আসামের উপর বাঙালীদের ক্রমপ্রসরমাণ বৈভবটা সম্পূর্ণরূপে আইনসঙ্গত হয়ে গেল। আসামকে নিজের দেশ বলে ভাবতে আর কোন সৌপর্দনীয় বাধা রইল না। বাঙালীর ভাগ্য-দেবতা তখন একবার মুচকে হেসে থাকবেন।

কেন না, বধিবার যারা, তারা ততদিনে গোকুলে বাড়তে শুরু করেছেন। আসামে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ সহজ পথে বা স্বাভাবিকভাবে হয়নি। পথে অনেকগুলি দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতা ছিল। প্রথম এবং প্রধান প্রতিবন্ধকতা—স্থানাভাব। সেখানে বাঙালীরা উপছে পড়ছে। লেখা-পড়া শিখতে হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব দ্বারস্থ হতে হয়। অগত্যা, আসামের মধ্যবিত্ত শ্রেণী গোড়া থেকেই বাঙালীদের সম্পর্কে একটা বিদ্বেষ-বিরূপতা নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অন্য কোন রাজ্যে অন্য দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এমন অবস্থায় একই দুঃখজনক ঘটনা ঘটত—এইটে প্রাণীবিদ্যার প্রাথমিক সূত্র। যেদিকেই যাও—বাঙালীরা পথরোধ করে আছে। এমন অবস্থায় একটাই প্রতিক্রিয়া

হয়—আক্রোশ। আসামের মধ্যবিত্ত শ্রেণী যত পরিপুষ্ট হয়েছে, প্রাণীবিদ্যার একই সূত্র ধরে এই আক্রোশটাও ততই তেজীয়ান হয়েছে।

এই করতে করতে ১৯৪৭ সন এসে গেল। ক্ষমতা হস্তান্তরের সেই ডামাডোলে আসামের কংগ্রেসী নেতারা একটা মতলব হাঁসিল করে ফেললেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তার ইনডিয়া উইনস ফ্রীডম বইতে অকপটেই স্বীকার করেছেন যে গোপীনাথ বরদলই-এর ইচ্ছাক্রমেই সিলেট জেলা পাকিস্তানের হাতে চলে যায়। এরা বোধহয় ভেবেছিলেন যে না রহে বাঁশ তো না বাজে বাঁশরী—সিলেট গেলে একটা বড়ো ল্যাঠা চুকবে। কিন্তু ব্যাপারটা ব্যুমেরাং হল। সিলেট গেল কিন্তু সিলেটের যাবতীয় বাঙালীবাবুরা এককাট্টা হয়ে আসামে এসে আশ্রয় নিলেন। একেবারে ইতিহাসের নিজের হাতের গড়া সমস্যা—কোথাও এতটুক ফাঁক নেই।

সেই সঙ্গে ইতিহাস আরও একটু অলংকার জুড়ে দিল। দেশ বিভাগের পর পূর্ব-বাংলা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে শরণার্থীরা এসে পৌছতে শুরু করল। পশ্চিমবঙ্গেই বেশি এল, কিন্তু আসামেও গেল প্রচুর। এরা বাধ্য হয়েই এল, অন্য কোন চুলোয় জায়গা হল না বলেই এল। দিল্লীর বোঝাপড়ায় যখন দেশ বিভাগ হয়েছে তখন এই শরণার্থীদের ধকলটা দিল্লীরই সামলানো উচিত ছিল কিনা আজ আর তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। পরবর্তীকালের এইসব বাঙালীরা বাইরের কোন রকম সাহায্য ছাড়াই, এমন কি বাইরের সব রকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, যেমনভাবে নিজেদের পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন করেছে তার কোন তুলনা নেই—এবং এদের সেই গৌরব—আক্ষরিক অর্থে—চোখের জলে ধুয়ে গেছে। কারণ, আসামের দিক থেকে এটি ছিল যেন গোদের উপর বিষফোড়া। অসমীয়ারা যে এরপর নিজেদের রাজ্যেই সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে! আসামের অন্য সবকিছুরই বা কি উপায় হবে?

আসামে বর্তমানে যে গোলমালটা চলছে কিছুদিন আগে পর্যন্তও তার পোশাকী নাম ছিল—ল্যাংগুয়েজ রায়ট, মানে ভাষা-দাঙ্গা। নামটার একটু ইতিহাস আছে। ব্রিটিশদের অধীনে আসবার আগে পর্যন্ত আসামের একটা সুসম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল। এখানে কেবল সাহিত্য আর সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। অসমীয়া ভাষা ও বাংলা ভাষার মধ্যে কোনটা প্রাচীনতর তা নিয়ে দুই পক্ষের পণ্ডিত ও উগ্রপন্থীদের মধ্যে বিরোধ নিকট ভবিষ্যতে মিটবার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অসমীয়া গদ্য যে বাংলা গদ্যের চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ তার লিখিত প্রমাণ আছে। ভারতবর্ষের মতো পোড়া দেশ না হলে আসামের বুরঞ্জী-সাহিত্য (বুরঞ্জী মানে ইতিহাস) এতদিনে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। আসামের সেই মধ্যযুগীয় সমৃদ্ধির উপর হঠাৎ আধুনিক যুগের ঝড় এসে আছড়ে পড়ল—এল বঙ্গ-সংস্কৃতির ভেক ধরে। মুদ্রণালয়, পুস্তকালয়, বিশ্ববিদ্যালয় সবই তখন কলকাতায় বাঙালীর কব্জায়। বাংলা সাহিত্যেরও তখন রাজযোগ। এমন অবস্থায় অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্য যে প্রচণ্ড রকম মার খাবে সে তো অবধারিত। আসামের আরেকটা মুশকিল এই হল যে বাঙালীর সমাজ এবং ভাষার সঙ্গে তার নিজের সমাজ এবং ভাষার তেমন অনতিক্রম্য কোন প্রভেদ নেই। এই অপরাধটা নিশ্চয়ই বাঙালীর নয়—কিন্তু রাগের সময় কি আর অত চুলচেরা বিচার থাকে ; মাতৃভাষায় নিজের লোকের সঙ্গে কথা বলতে অন্তরায় ঘটলে তখন সব ভাষার লোকেরই মাথা গরম হয়। আত্মপ্রকাশের আকতিকে আত্মরক্ষার জোয়ালে জুড়তে হলে তার থেকে নানারকম বিসম্বাদ দেখা দেবেই।

এ ব্যাপারে বাংলা সংবাদপত্রগুলিও তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেনি। বন্যা, ভূমিকম্প, দাঙ্গা ইত্যাদি অতি কদাকার ঘটনাগুলি ছাড়া আসাম ও আসামের অন্য সবকিছু চিরদিন বাংলা সংবাদপত্রে সম্পূর্ণ অবহেলিত থেকেছে। নিজেদের ভাষা ও সমাজ

নিয়েই যাদের এতটুকু মাথাব্যাথা নেই, প্রতিবেশীর ভাষা ও সমাজ নিয়ে তারা মাথা ঘামাবে এমন আশা করাই বাতুলতা। অসমীয়া লেখকদের দিয়ে বাংলা লেখাবার চেষ্টা করা তো দূরস্থান, আজও পর্যন্ত এরা এদের অগণিত অসমীয়া পাঠকবৃন্দের কথা মনে রেখে একটা লেখাও ছেপেছে বলে স্মরণ হয় না। এর ফলে আসাম ক্ষুব্ধ হয়েছে, স্বাভাবিক কারণেই—বাঙালীব ভাবনা থেকে অসমীয়া সমাজও তফাৎ হয়ে গেছে। বাংলা চলচ্চিত্রের জৌলুসে অসমীয়া চলচ্চিত্র আজও সম্পূর্ণ কোণঠাসা হয়ে আছে—এ ব্যাপারেও আসাম তার প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অন্য সব বৃত্তির ক্ষেত্রেও একই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে বলে ধবে নেওয়া চলে। বাঙালীর নিজেরই সব ব্যাপারে অনটনের সংসার, এই যুক্তিটা যতই অকাট্য হোক, এক্ষেত্রে সে কথা কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক। নিকটবর্তী দুটি সম্প্রদায়েব মধ্যে যখন বিভেদ ঘটে তখন সেই বিভেদটা যুক্তি দিয়ে ভরাট হয় না, ভরাট হয় বিদ্বেষ দিয়ে।

ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতায় আসামও এই সবকিছুব নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিয়েছে, আজও পুরোদমে নিয়ে চলেছে। স্বাধীনতার পর থেকে একে একে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্য যাবতীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তরিত হয়ে যাবাব পব আসামের বাঙালীদের অন্য সব নাগরিক অধিকার তো জাহান্নমে গেছেই, এমন কি নিতান্ত বেঁচে থাকবার অধিকারটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। সবকিছু সবিশদ লিখলে তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে হয়তো তাই নিয়েই নতুন একপ্রস্থ হাঙ্গামা হয়ে যাবে, তবে এটুকু স্পষ্ট করেই বলা চলে যে আসামের বাঙালীদের তুলনায় আমেরিকার নিগ্রোরাও রাজার হালে আছে। এই পাপ বিদায় করবার অন্য সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর এবার একটা নতুন ধান্দা ধরে বলা হচ্ছে যে এরা বিদেশী নাগরিক। এই হাস্যকর প্রয়াসের প্রতিবাদ করতে যাওয়াও হাস্যকর। উদ্যোগও ব্যর্থ হবে, পরবর্তী নির্বাচনের পরেই পরিত্যক্ত হবে,—কিন্তু পিছনে রেখে

যাবে অনেক তিক্ততা এবং আরও বিদ্বেষ। এইসব ন্যক্কারজনক পথে কোন জাতীয় সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

গত ত্রিশ বছর ধরে প্রায় একটানা হাঙ্গামা চালিয়ে যাবার পরেও আসামের বাঙালী সমস্যার কিছুমাত্র সুরাহা হয়নি। আসামের বেকার সমস্যা যেমন ছিল তার চাইতেও খারাপ হয়েছে; অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কোন সমৃদ্ধি ঘটেনি। এতে বরং আসামের অনেক ক্ষতি হয়েছে। আসাম ইতিমধ্যেই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এরপর একদিন হয়ত দেখা যবে নিজেদের রাজ্যেই অসমীয়ারা সংখ্যালঘু।

হানাহানি তো অনেক হলো। উভয় পক্ষেরই কি এখন মাথা ঠাণ্ডা করে একবার ভেবে দেখা উচিত নয়, যে এর শেষে পরিণাম কোন সর্বনাশে? ঘটনা কিন্তু এখন সময়ের চাইতেও দ্রুততর গতিতে গড়িয়ে চলেছে।

'আমরা বাঙালী' নামে প্রতিষ্ঠানটি পথিপার্শ্বের দেওয়াল থেকে সম্প্রতি দৈনিক সংবাদপত্রের শিরোনামে উন্নীত হয়েছে। ত্রিপুরার এবং পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ দফতর এর উপর সজাগ ও সক্রিয় নজর রাখছেন। দুটি রাজ্যের মহাকরণের উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। দিল্লীতেও নিশ্চয়ই দিস্তা দিস্তা রিপোর্ট জমা হচ্ছে।

শহরের দেওয়াল থেকে সংবাদপত্রের শিরোনামে আরোহণ করতে প্রতিষ্ঠানটির সময় লেগেছে দশ বছর। ভালো-মন্দ প্রকৃতিস্থ-অপ্রকৃতিস্থ—সব রকম মতাদর্শেরই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সময়ের দরকার হয়। প্রয়াসের অথবা প্রচারের দরকার হয়। মাত্রই দশ বছরের মধ্যে, বিশেষ কিছু প্রয়াস, এমনকি প্রচার, ছাড়াই 'আমরা বাঙালী' সংবাদপত্রের মাথায় পৌঁছে গেছে। কোন সন্দেহ নেই যে কৃতিত্বটা চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো। সত্যকারের গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা চোখের সামনে এমন দ্যাখ-দ্যাখ করে ঘটে যেতে কদাচিৎ দেখা যায়।

এবং এই তাড়াহুড়োয় আসল জিনিসটাই সঙ্গে আসেনি। ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়ায় একটা রক্তাক্ত ঘটনার উপর ভর দিয়ে 'আমরা বাঙালী' সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে এসেছে এবং সেখান থেকে কোন মহলে আশা, কোন মহলে আশঙ্কা, কোথায়ও কৌতূহল, কোথায়ও বা কৌতুক সঞ্চার করছে। অথচ 'আমরা বাঙালী' এই নামটুকু ছাড়া প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে অধিকাংশ বাঙালীর স্পষ্ট কোন ধারণাই নেই। সর্বনাম দিয়ে নাম রাখলে এই বিপদ হয়—নামটি উচ্চারণ করলে বাঙালীমাত্রই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন, অথচ এটা সাপ কি ব্যাং তাও জানা নেই। নামটাও হয়ত তাড়াহুড়োয় রাখা হয়েছে, তাই এমন বিভ্রাট।

বছর দশেক আগে শহর ও শহরতলীর দেওয়ালে কতকগুলি শ্লোগান দেখা যায়—তলায় লেখা 'আমরা বাঙালী'। পরবর্তী গৌরবের আলোকে ব্যাপারটিকে গুরুত্বপূর্ণ আত্মপ্রকাশ বলে মনে হয়, কিন্তু সেদিন তেমন কিছু বোঝা যায়নি। দেওয়ালগুলো তখন ছিল নানা বৈপ্লবিক শ্লোগানে ঠাসা।

—'আমরা বাঙালী' মঞ্চের এক কোণে দাঁড়িয়ে কিছুটা রিলিফ দিত। কৌতুকটা খুব জমে উঠত কেননা এদের শ্লোগানগুলোতেও কৌতুকপ্রদ সব ব্যাকরণের ভুল। একটা শ্লোগান ছিল, 'বাঙালী গর্জে ওঠ'। মিহি বাঙালীকে আচমকা গর্জে উঠতে বললে তার যে ভিরমি লেগে যেতে পারে সে আশঙ্কার কথা বাদ দিলাম। কিন্তু কেন গর্জে উঠব, কি বলে গর্জে উঠব, গর্জে উঠে কারো উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব নাকি কেবল গর্জাতেই থাকব সে-সব কিছুই বলা হল না।

শুধু 'গর্জে ওঠ' বললে বাক্যের ভাবটা সম্পূর্ণ হয় না। তারপরে বলা হলো বাঙালী জাগো। খুব ভালো কথা। কিন্তু জেগে উঠে স্ত্রীর তাড়া খেয়ে বাজারে যেতে হবে, নাকি সম্পূর্ণ নতুন কিছু কবতে হবে সে-বিষয়ে কোন নির্দেশ দেওয়া হল না। অফিসের নিত্য -যাত্রীরা এইসব অগ্নিস্রাবী শ্লোগান নিয়ে একসময়ে প্রচুর ঠাট্টা তামাসা করেছে।

কিন্তু আমরা বাঙালী আজ দেওয়াল ছেড়ে সংবাদপত্রের শিরোনামে, মন্ত্রিসভাব বৈঠকে, পুলিশের ডায়রিতে এবং আদালতের এজলাসে উঠে এসেছে। কিছুদিন আগেও যা কেবল হাস্য কৌতুকের বিষয় ছিল আজ তা একটি রক্তাক্ত বিস্ময়চিহ্ন। ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়ায় সম্প্রতি যে কলঙ্কময় ও বিপজ্জনক ঘটনা ঘটে গেছে তার এক পক্ষ আমরা বাঙালী। এই ঘটনার জন্য কোন পক্ষ কতটা দায়ী তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অবকাশ আছে এবং তা অবহেলিত হবে না। কিন্তু এই ঘটনায় সবচাইতে বেশি লাভবান হবে 'আমরা বাঙালী। আর সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে

ত্রিপুরার বাঙালী ও উপজাতিদের সেই সম্পর্ক যা কোনদিনই খুব একটা সুস্থ-সবল ছিল না। এছাড়াও কাছে দূরে আরও অনেক জায়গায় এই ঘটনার ছায়া পড়বেই—কোন কোন জায়গায় ঝড়ও উঠতে পারে।

তেলিয়ামুড়ার পরে আমরা বাঙালী আজ একটি দুর্ধর্ষ সত্য। এদের স্বীকৃতি দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্নটাও ঘটনাক্রমে বাতিল হয়ে গেছে। নির্বাচনের সদর দরজা দিয়ে না হলেও এরা ভারতীয় রাজনীতির আখড়ায় ঢুকে পড়েছে। কেবল ঢুকে পড়েনি, সগবে এবং সগৌরবে একেবারে সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন চকিত সাফল্যে প্রবীণতর রাজনৈতিক দলগুলোরও মাথা ঘুরে যায়, অতএব 'আমরা বাঙালীর' আচরণে কিছুটা আতিশয্যও প্রকটিত হতেই পারে।

অথচ এই আগন্তুকের কুলশীল দূরস্থান, এই মুহূর্তে এ কোথায় যেতে চায়, কেমন করে যেতে চায়, সে সব কিছুই আমরা জানি না। আমাদের সাংবাদিকরাও স্পষ্ট করে কিছু জানে না। সরকার তথা পুলিশ দফতর কতটা জানে তা তারাই বলতে পারে। সভা-শোভাযাত্রা করে ইশতাহার ছেপে বা অন্য দল ভেঙে আমরা বাঙালী জন্মায়নি, মহৎ কোন সেবাব্রত বা বৃহৎ কোন আন্দোলনের মাধ্যমে এ-দল গড়ে ওঠেনি। এরা যে ঠিক কি করতে চায় এবং কেমন করে করতে চায় যদিও সে-কথা এরা আজও পর্যন্ত খোলসা করে বলেনি তবুও লোক পরম্পরায় জানা যায় যে বিশ্বের যেখানে যত বাঙালী আছে তাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে বাঙালী জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এ-দলের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যটা যে মহৎ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কাজ শুরু হবে কোথা থেকে? কোন পথ ধরে অগ্রসর হতে হবে? এ সব প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা জানবার কোন উপায় নেই। এরা নাকি দুই বাঙালাকে এক করতে চান এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত

হবে গোটা ত্রিপুরা আর আসাম, বিহার ও ওড়িশার সীমান্তবর্তী বাঙালী অধ্যুষিত এলাকাগুলি। এহেন লোভনীয় প্রস্তাবে কোন্ বাঙালী না খুশী হবে! বাঙালী জাতি আজ নিতান্তই খণ্ড-ছিন্ন অধঃপতিত হয়ে আছে, জাতিটিকে অবিলম্বে উদ্ধার করা প্রয়োজন। 'আমরা বাঙালী' কিন্তু অদ্যাবধি নিজেদের এই সব মিষ্টি ও মহৎ কথাগুলো খোলসা করে বলেনি। হয়তো কাজে দেখিয়ে দেবে বলেই।

ইতিমধ্যে 'আমরা বাঙালী' কিছু কিছু কাজ দেখিয়েছে। সকাল বেলার সলতে পাকানোর মতো শহরতলীর দেওয়ালে শ্লোগান লেখার পর্বটা না হয় বাদই দেওয়া গেল। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম এবং বিহারের গত কয়েকটি নির্বাচনে 'আমরা বাঙালী' কিছু কিছু স্বতন্ত্রপ্রার্থীর হয়ে প্রচার যুদ্ধ করছে। তার ফলাফল সকলেরই জানা, 'আমরা বাঙালী' সমর্থিত প্রার্থীদের সকলেই গো-হারান হেরেছে --প্রায় সকলেরই জামানত জব্দ হয়েছে। এদেশের হাবাগোবা ভোটাররাও এদের শ্লোগানে ভোলেনি। তা হোক, ইতিহাস যেন স্মরণ রাখে যে, 'আমরা বাঙালী' প্রথমটায় সাংবিধানিক পথেই লড়াই শুরু করেছিল।

তেলিয়ামুড়ার বিস্ফোরণটা এখানে একটু তলিয়ে দেখা দরকার। যে ঘটনায় লোক মরবে, বাড়ি জ্বলবে, বহু গৃহস্থ বাস্তুহারা হবে এবং একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তির প্রাদুর্ভাব ঘটবে, সেই ঘটনা কেন সুদূর ত্রিপুরার অখ্যাত তেলিয়ামুড়ায় সংঘটিত হল? এর অনেকগুলো ঐতিহাসিক এবং সাম্প্রতিক কারণ আছে। ত্রিপুরার আদি সমস্যা সেখানকার উপজাতিদের নিয়ে। বাঙালী বাস্তুহারারা এসে, নিজেদের উদ্যমে ও কংগ্রেস সরকারের সহায়তায়, স্থানীয় উপজাতিদের বাস্তুহারা করে দেয়। নিজেদের দেশেই উপজাতিরা মর্মান্তিক রকম সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। ত্রিশ বছর ধরে ক্রমাগত কোণঠাসা হতে হতে অবশেষে ত্রিপুরার উপজাতিরা ঐক্যবদ্ধ হতে

শুরু করে, আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়। ফলাফল শেষ পর্যন্ত যা-ই হোক, ত্রিপুরার বাঙালী ও উপজাতিদের মধ্যে একটা রক্তাক্ত সংঘর্ষ ইতিহাসের কর্মসূচীতে অবধারিত ছিল। তা যে কোন মুহূর্তেই ঘটে যেতে পারে।

ঠিক এমন সময় ত্রিপুরায় রাজনৈতিক দৃশ্যান্তর ঘটল। কংগ্রেস মুক্তকচ্ছ হয়ে মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে গেল। জনতার নেতৃত্বে সর্ব-দলীয় সরকার হল। কিন্তু টিকল না। কংগ্রেসের তরী ডুবে যেতে যারা জনতার ভেলায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, জনতাও ছত্রখান হয়ে যেতে তারা অকূল পাথারে পড়লেন। ত্রিশ বছর ধরে এরা সরকারী প্রশ্রয় পেয়ে অভ্যস্ত, সরকারী প্রশ্রয়ে ত্রিপুরার অরণ্য দোহন করে এরা পরিপুষ্ট। রাজ্যের রাজনৈতিক পটভূমি পালটে যেতে এই বাঙালী বর্ধিষ্ণু সমাজ আতঙ্কগ্রস্ত হলেন, এক ঝাঁক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী হঠাৎ বেকার হয়ে পড়লেন। একেবারে অসহায় অবস্থা একদিকে উপজাতিরা সংঘবদ্ধ হয়ে উঠছে, অপরদিকে সরকারও বিরূপ। কিন্তু অসহায় হলেও এরা যথেষ্ট শক্তিশালী—গত ত্রিশ বছরে, বৈধ অথবা অবৈধ উপায়ে, এদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয়েছে। অথচ, রাজ্যে এমন একটা রাজনৈতিক দল নেই যাকে সামনে রেখে এই ক্ষমতা ব্যবহার করা চলে। ওদিকে বামফ্রনট সরকারও ক্ষমতায় বসে প্রথমেই এদের স্বার্থে ঘা দিলেন—নির্বাচনের আগে উপজাতিদের হাতে জমি ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রক্ষা করতে অগ্রসর হলেন।

ঠিক এমনি সময় ত্রিপুরার 'আমরা বাঙালী' মাৎ মাৎ করে দেওয়াল ছেড়ে রাস্তায় নেমে এল। ত্রিপুরার বর্ধিষ্ণু বাঙালী সমাজেরও তখন এমন বেপরোয়া অবস্থা যে সাপ কি রজ্জু তা যাচাই করে দেখবার ফুরসৎ নেই। তাছাড়া, 'আমরা বাঙালী' নামটার মধ্যেই বাঙালীর স্থূল জাতীয়তাবোধে সুড়সুড়ি দেবার ব্যবস্থা আছে। তেলিয়ামুড়ায় সম্প্রতি যে লজ্জাকর ঘটনা ঘটে গেল সেটা

ঘটতই, হয়তো দু-চার দিন আগে-পরে ঘটত, হয়তো আরেকটু বিচ্ছিন্ন—বিক্ষিপ্তভাবে ঘটত,—কিন্তু ত্রিপুরার বাঙালী ও উপজাতি সমাজের মধ্যে যে তিক্ত-অবিশ্বাস পুঞ্জিভূত হয়েছে তাব বিস্ফোবণ ঘটতই। কংগ্রেসী আমলে এমন ঘটনা ঘটলে তখন বলা হয়েছে—বিদেশী মিশনারিদের উসকানিতে উপজাতিদের বিক্ষোভ। এমন বিক্ষোভ দমন করবার জন্য অতীতে বহুবার সেনা-বাহিনীকে তলব করা হয়েছে। ত্রিপুরায় এখন কংগ্রেস নেই, জনতাও প্রত্যাখ্যাত,-রাজ্য জুড়ে খাঁ খাঁ করছে রাজনৈতিক শূন্যতা। ত্রিপুরার এই বাজনৈতিক শূন্যতা ভরাট করার চেষ্টা করছে 'আমরা বাঙালী'। শূন্যতাটা কতটুকু ভরাট হল বা হল না তা আস্তে-ধীরে বোঝা যাবে, কিন্তু এই সুবাদে 'আমরা বাঙালী' ত্রিপুরার অন্যতম রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে।

এবার দেখা যাক 'আমরা বাঙালী'ব প্রভাব এরপরে কোনদিকে কতদূর ছড়িয়ে পড়তে পারে। ত্রিপুরারই মতো পশ্চিমবঙ্গেও বাম-ফ্রনটেব বাইবে এক বিরাট-বিশাল রাজনৈতিক শূন্যতা বিরাজ কবছে। এখানেও কংগ্রেস নেই, জনতা প্রত্যাখ্যাত। এতকাল যারা কংগ্রেস করেছেন, জনতাকে যাবা আঁতুড় ঘরেই খতম কবেছেন—তাবা এখন হন্যে হয়ে একটা রাজনৈতিক অবলম্বন খুঁজছেন। এখানেও বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বিবিধ প্রকারেব হতাশা অত্যন্ত গভীর এবং ব্যাপক। এখানকাব বাঙালী সমাজের সামনেও ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত এবং ভয়াবহ। পুরো জাতটা এখানেও সমান দিশেহাবা। এমন দিশেহারা অবস্থায় অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবান জাতিরাও ছেঁদো কোন মতবাদ ধরে ঝুলে পড়ে—জার্মানী যেমন ফ্যাসিবাদ ধরে ঝুলে পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিবেশে 'আমরা বাঙালী'র মতো প্রতিষ্ঠানের তরতর করে বেড়ে উঠবাব ও দ্যাখ-দ্যাখ করে ছড়িয়ে পড়বার কথা।

কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, এখনো তেমন ঘটনা ঘটেনি।

নির্বাচনে চোট খাবার পর পশ্চিমবঙ্গে 'আমরা বাঙালী' এই কিছু দিন আগে পর্যন্তও দেওয়াল আঁকড়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। কিন্তু তেলিয়ামুড়ার সাফল্যের পর কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতায় এরা লাঠিসোটা নিয়ে শান্তিপূর্ণ কয়েকটি শোভাযাত্রা বের করেছে। এদের মুখে একটা নতুন স্লোগানও শোনা গেছে, 'বাঙালীস্তান' চাই। পাকিস্তান কথাটি নিয়ে আমাদের বিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠরা একসময়ে খুব দাঁত বের করে হেসেছিলেন বলে শুনেছি। 'বাঙালীস্তান' কথাটি নিয়ে তাই তামাসা করতেও ভরসা হয় না। তবুও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে 'আমরা বাঙালী' অদূর ভবিষ্যতে খুব একটা সুবিধে করে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। পারবে না, কারণ, এই বাংলায় এখন সি পি আই (এম)-য়ের নেতৃত্বে বাম-ফ্রনটের শাসন বেশ দাপটের সঙ্গে চলছে। 'দেশ ভাসানো বন্যা, দেশ জ্বালানো খরা, বিদ্যুৎ সংকট, মরিচঝাঁপি এমন কি নদীয়ার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—এদের বিচলিত করে থাকলেও এতটুক টলাতে পারেনি। এরা এমনকি শেয়ালদাব জঙ্গী হকারদেরও বিনা রক্তপাতে স্থানচ্যুত করেছে। ঘটনা থেকে ঘটনায় বাম-ফ্রনটের আত্মপ্রত্যয় যে এখনো বাড়তির দিকে বিরোধী রাজনৈতিক নেতারও তা সশঙ্কচিত্তে স্বীকার করে থাকেন। এর সঙ্গে রাজনৈতিক পাঞ্জা লড়তে গিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি কব্জি জখম হয়েছে, 'আমরা বাঙালী' এর কাছে ছেলে মানুষ। শহরাঞ্চলে বিশেষ করে কলকাতায় যেখানে অবাঙালীরা বেশ ব্যাপকভাবে বাঙালী পাড়ায় ঢুকে পড়ছে সেখানে কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত বিদ্বেষ আর উত্তেজনা জমছেই। তাপ বাড়লে এই বিদ্বেষ আর উত্তেজনা একদিন ফেটে পড়বেই। এই দুর্ঘটনাটিকে ত্বরান্বিত করে 'আমরা বাঙালী' পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে কিছু কিছু গোলমাল বাধিয়ে দিতে পারে—কিন্তু কোন রাজনীতির চিঁড়ে তাতে ভিজবে না।

পশ্চিমবঙ্গে ততটা সুবিধে না হলেও উত্তরবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক-

অর্থনৈতিক-সামাজিক অনিশ্চয়তা 'আমরা বাঙালী' টাইপের আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ রকম উপযোগী হবে বলে অনুমান হয়। রাজনীতির মঞ্চে উত্তরবঙ্গের চিরদিনই কাটা সৈনিকের ভূমিকা। ব্যবসা বাণিজ্য এবং চা বাগানের উচ্চতর পদগুলি সব অবাঙালীদের দখলে চলে গেছে। বেকার সমস্যা এতই ব্যাপক যে এ নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাই না। আর কিছুই অসম্ভব বলে ঠেকে না—এমনকি বাঙালীস্তানও না। উওরবঙ্গের অনেকেই এখনো মনে-প্রানে বিশ্বাস করে যে, ১৯৭১ সনে বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত না করে ইন্দিরা গান্ধী দারুণ ভুল করেছেন! এখানে 'আমরা বাঙালীর' কিছু কিছু সমর্থক জুটবেই।

আরও আছে। উত্তরবঙ্গের সুবিস্তৃত এলাকায় নেপালী ও বাঙালীরা পাশাপাশি বাস করে। সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য বলতে যা বোঝায় তা এদের মধ্যে কোনকালেই ছিল না- থাকবার কথাও নয়। ক্রমে নেপালীদের বৈভব বাড়তে শুরু করল আর তার চাপ এসে পড়ল বাঙালীদের উপর—সম্পর্কটা তাতে আরও বিগড়ে গেল। এরপর নেপালীদের নেপালীয়ানা যত বাড়ছে, বাঙালীদের বাঙালীয়ানাও ততই উত্তেজিত হয়ে উঠছে। অপর দিকে আছে রাজবংশীরা। নিজেদের দুর্বল জেনে এতকাল এরা অনেক অপমান হজম করেছে। 'অপারেশন বর্গা' ভালয় ভালয় কার্যকর হয়ে গেলে রাজবংশীদের সঙ্গে বাঙালীর সম্পর্ক আরেকটা বড় চোট খাবে। ক্রমবর্ধমান হতাশা ও উত্তেজনার রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটতে ঘটতে উত্তরবঙ্গের অবস্থা হঠাৎ এমন হয়ে উঠতে পারে যখন কেবল শ্লোগানেই দপ করে আগুন জ্বলে উঠবে - ইতিহাসে এ-ধরনের অনেক নজির আছে। 'আমরা বাঙালী' আওয়াজের পিছনে যারা আছেন এসব তত্ত্ব তাদের না জানা থাকবার কথা নয়।

পশ্চিমবঙ্গ আর উত্তরবঙ্গে তো এই রকম অবস্থা। এছাড়া বাংলার বাইরে যেখানেই বেশ কিছু বাঙালী বেশ কিছুদিন ধরে

বসবাস করছে সেখানেই ভয়ঙ্কর পরিমান অসন্তোষ, হতাশা, ঈর্ষা, ক্ষোভ, আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা এবং অবসাদ স্তূপীকৃত হয়ে আছে—স্তূপটা ক্রমাগতই মাপে বাড়ছে। এই বিপজ্জনক অবস্থার জন্য কেবল অ-বাঙালীরাই দায়ী নন, কেবল বাঙালীরাও দায়ী নন। এইটে আমাদের ঔপনিবেশিক অতীতের উত্তরাধিকার। রোগের বহুবিধ লক্ষণ অনেক আগে থাকতেই ফুটে বেরোচ্ছিল। দু'একজন সত্যদ্রষ্টা এ-বিষয়ে বেশ স্পষ্ট ভাষায় আমাদের হুঁশিয়ারও করেছিলেন কিন্তু দশায় পেলে যেমন হয়—আমরা কোনকিছুরই পরোয়া করিনি। অবশেষে আজ আর ধনুর্গুণটুকুও অবশিষ্ট নেই। অপরদিকে এতকাল যারা খাদ্য ছিল ইতিহাসের চক্রের আবর্তনে তারাই আজ খাদক হয়ে উঠেছে। এমন কোণঠাসা অবস্থায় যে-কেউই যা-কিছু ধবে ঝুলে পড়তে পারে। বাঙালীরা আবার স্বভাবতই একটু ভাবপ্রবণ জাতি।

উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে—বিশেষ করে আসামে, যে বিপুল সংখ্যক বাঙালী মাটি কামড়ে পড়ে আছে, ইতিহাসের অভিশাপগ্রস্ত সেই বাঙালী সমাজের উপর 'আমরা বাঙালীর' শ্লোগানগুলো কি ধবনেব প্রভাব বিস্তার কবতে পারে—এবং তার প্রতিক্রিয়া কতদূর গড়াতে পারে—এসব কথা সংশ্লিষ্ট মহলের এখনই বিবেচনা করা উচিত। সুদীর্ঘকাল ধরে নানাবিধ কারণে যে সব বাঙালী আসামে এসে আটকে গেছে তাদের সঠিক সংখ্যা কেউ জানে না। কেউ কেউ অনুমান করেন যে আসামে হিন্দু-মুসলিম বাঙালীরাই ঠিক সংখ্যাধিক্য না হলেও—উনশ-বিশ। বাঙালীদের প্রতি কিছুটা বাড়তি বিদ্বেষের অন্তর্নিহিত কারণ হয়তো এটাই—নিজভূমে পরবাসী হয়ে পড়বার আতঙ্ক।

আসামে বাঙালীদের অবস্থা খাঁচায় আটকে পড়া ইঁদুরের মতো। মাঝে মাঝে ভাষা-আন্দোলন বা ওই জাতীয় কোন অজুহাতে নিষ্ঠুর খোঁচা মেরে এদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে এরা কত অসহায়।

এই জটিল এবং নির্মম ব্যাপারটিকে বাঙালীরা এতকাল বলেছে—কপাল! এক সময়ে এরা অনেক অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করেছে—জাতিগতভাবে তার বিনিময়ে এখন কিছু অন্যায় সহ্য করতেই হবে। কিন্তু এই সনাতন যুক্তিটা আসামের উঠতি বাঙালী যুবকেরা আর মানতে রাজি নয়। গত ১৯৭২-৭৩ সনের ভাষা দাঙ্গার সময় আসামের বিভিন্ন শহর থেকে ছোট ছোট কয়েকটি দল এ ব্যাপারে নো-হাউ সংগ্রহ করবার জন্য কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। কোন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে এরা কোনদিন এতটুকু সাহায্য পায়নি'। যদিও এদের অসহায়তা নিয়ে রাজনৈতিক লেন দেন হয়েছে বিস্তর। এদের অস্থিরতা অনিবার্যভাবেই স্ফুটনাঙ্ক ছাড়িয়ে গেছে অনেক দিন—'আমরা বাঙালীর' স্লোগানের ঝড় উঠলে আসাম এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হবে না।

ভয় সবচাইতে বেশি কাছাড় জেলা নিয়ে। এখানে গ্রাম-গঞ্জ সর্বত্রই বাঙালীদের একাধিপত্য—বাঙালীরা এখানে নির্ভয়ে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে থাকে। এই সব সুযোগ-সুবিধা আছে বলেই এখানে বিক্ষোভটাও অনেক বেশি—কারণ দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা তো সেই গৌহাটি। এই আকারহীন এলোমেলো স্লোগানের হাওয়ায় দপ করে ফেটে পড়তে পারে। ত্রিপুরার পাশেই কাছাড়—বাঙালীয়ানার দমকা হাওয়া আপনা থেকেই উড়ে আসবে। আসামের দুঃসহ অবস্থা থেকে বাঙালীরা কেমন করে নিষ্কৃতি পেতে পারে স্বয়ং ভগবানও বোধহয় সঠিকরূপে তা জানেন না। কিন্তু এরা যদি হঠাৎ বাঙালীস্তান বলে ক্ষেপে ওঠে তবে স্বয়ং ভগবান এদের ভরাডুবি রুখতে পারবেন না।

আসল কথা হল, বাঙালীর আজ খুবই বিপর্যস্ত অবস্থা—ঘরে বাইরে সর্বত্রই, সর্ব ব্যাপারে। এমন অবস্থায় সবচাইতে বেশি প্রয়োজন সতর্ক হওয়া, সবচাইতে বড় ভয় হঠকারিতা করে হঠাৎ কিছু করে বসা। স্লোগানে মেতে এর আগে আমরা বারম্বার নিজেদের সর্বনাশ করেছি। অতঃপর একটি খড়কুটোর ওজনেই—দীর্ঘদিনের জন্য বাঙালীর পিঠ ভেঙে পড়তে পারে।

গত ডিসেমবর মাসে (২২ ডিসেমবর ৭৮) ফ্রীডম অব রিলিজিয়ান বা ধর্মীয় স্বাধীনতা শিরোনামে লোকসভায় একটি বেসরকারী বিল পেশ করা হয়। বিলের উত্থাপক প্রস্তাব করেছেন : অতঃপর বলপূর্বক, প্রলোভন দ্বারা বা অন্য কোন অসদুপায়ে কাউকে ধর্মান্তরিত করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে।

প্রস্তাবটি লোকসভায় পেশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের বিভিন্ন স্থানে—বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতে—একটা তীব্র অসন্তোষ দানা বেধে ওঠে। কোন কোন জায়গা থেকে শান্তিভঙ্গের অভিযোগ আসে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা তা বারবার অস্বীকার করেন এবং বারংবার আশ্বাস দিয়ে বলেন—এই আইনে ভয়েব কিছু নেই। কলকাতা শহরেও এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মিছিল বেবিয়েছে। —তবে তা এতই নিবীহ যে পরাক্রমী মিছিল দেখে অভ্যস্ত কলকাতার নাগরিকদের তা চোখে পড়েনি।

উল্লেখযোগ্য : বিলের খসড়া প্রস্তাবে কোন ধর্মের নামোল্লেখ নেই। অথচ মুসলমানরা নয়, বৌদ্ধরা নয়, পার্শি বা ইহুদী নয়, প্রস্তাবটিতে উত্তেজিত হয়েছে কেবল খ্রীস্টানরা। সবচাইতে বিস্ময়কর কাণ্ড : এমনটা হওয়ায় কেউ কিন্তু বিস্মিত হয়নি। মন্ত্রীরা, আমলারা, জাতীয় সংবাদপত্রগুলো সবাই যেন ধরে নিয়েছিল—এমনটাই হবে, এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। অস্যার্থ ; প্রস্তাবটি যে মোটামুটিভাবে খ্রীস্টান ধর্ম উদ্দেশ্য করেই রচিত হয়েছে তা একরকম সবাই মেনে নিয়েছে। সর্বশেষ সংবাদ : প্রস্তাবটি নিয়ে দূর ও নিকটে উত্তেজনা প্রতিদিনই তীব্রতর হচ্ছে। আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনাও বাড়ছে। আর বাড়ছে বিদ্বেষ—গান বা শ্লোগানে যা ধৌত হয় না।

ধর্মে স্বাধীনতা নামাঙ্কিত প্রস্তাবটি পড়লে প্রথমেই যে কথাটি মনে হয় তা হল: এখনি এর কি প্রয়োজন ছিল? ভারতমাতার বিশাল সংসারে এমনিতেই তো ঝামেলার অন্ত নেই, তার মধ্যে আবার খুঁচিয়ে একটা নতুন ঝামেলা বাধাবার কি দরকার পড়ল। কথায় বলে কাউকে মারবার আগে ভগবান তাকে পাগল করে দেন। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও মনে হয় একই ব্যবস্থা। নইলে ঠিক এই মুহূর্তে একই সঙ্গে দেশে গোহত্যা বন্ধ করা, মদ্যপান নিষেধ করা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার জন্য সরকারী বেসরকারী সবাই এমন উদ্বেলিত হয়ে উঠল কেন? গোহত্যা বন্ধ না করেই তো মাঝে-মধ্যে টুকটাক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। হিন্দু ও মুসলিম সমাজের মধ্যে সাম্য বাড়ছে তেমন কোন সংবাদও তো সম্প্রতি পাওয়া যায়নি—তাহলে গোহত্যা নিয়ে এত মাতামাতি কেন? সুজলা বিহার সাহারা হবার আগেই মাফিয়া অর্থাৎ বনেদী মস্তানরা সেখানে খুব মনের সুখে রাজ্য বিস্তাব করছিল—এই মুহূর্তে মদ্যপান নিষিদ্ধ করে আরও বাড়তি উৎসাহ না দিলেও এদের চলে যেত। হিন্দি ভাষা নিয়ে মাঝেমাঝে নাড়াচাড়া করাটা তো এখন জাতীয় মুদ্রাদোষ। এত সব থাকতেও ধর্মীয় স্বাধীনতা নামক স্পর্শকাতর দানবটিকে ঠিক এই মুহূর্তেই খুঁচিয়ে তোলবার কি দরকার ছিল?

সাধারণ বুদ্ধিতে ব্যাপারটিকে একটা প্রকাণ্ড, এমনকি বিপজ্জনক নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হয়। কিন্তু দিললি অতটা নির্বোধ নয়। তবে? ন্যাজ তুলে না দেখলে এই রহস্যের সুরাহা হবে না। তার আগে খসড়া আইনের বয়ানটা একটু খতিয়ে দেখা দরকার।

আইনের বয়ানটি রগরগে আদর্শবাদে চুবানো। আমাদের সংবিধানের মতোই। এতে খুব স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষভাবে অপর কোন ব্যক্তির ধর্মান্তকরণের জন্য বলপ্রয়োগ করে, প্রলোভন দেখায়, প্রতারণা করে অথবা অন্য কোন অবৈধ উপায় অবলম্বন করে তবে তা দণ্ডনীয়

প্রথম দিকটায় মিশনারিরা আগে দুস্থের সেবা করেছে, ওষুধ দিয়েছে, তারপরে বাইবেলের বাণী শুনিয়েছে ; আগে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে লেখাপড়া শিখিয়েছে, তারপরে বাইবেল বাড়িয়ে দিয়েছে ; আগে শিশুদের দুধ খাইয়েছে, তারপরে যীশুর ভজনা শিখিয়েছে। এই ব্যাপারটিকেই মিশনারিদের কপটতা বলা হয় ; একটা জিনিসের লোভ দেখিয়ে সেইসঙ্গে অপর একটা জিনিস গস্ত করে দেওয়া ; শিক্ষা এবং সেবা সামনে রেখে তলে তলে ধর্মপ্রচার। একথা কিন্তু সকলেই স্বীকার করেন যে মিশনাবিদের আর যে গুণেবই অভাব থাক আন্তরিকতার অভাব ছিলনা। এই আন্তরিকতা পুরস্কৃত হয়েছে। উপজাতিদের মধ্যে যারা খ্রীস্টান হয়েছে খ্রীস্টান ধর্মকে তারা প্রাণের চাইতেও মূল্যবান মনে করে। উপজাতিদের একটা দোষ বা গুণ হল, এরা একবার যাকে সুহৃদ বলে চিনতে পারে, তাকে আর কিছুতেই ছাড়তে চায় না। কয়েক বছর আগে যখন শ্বেতচর্ম মিশনারিদের এদেশ থেকে দফায় দফায় বহিষ্কৃত করা হচ্ছিল তখন আমি ভ্রাম্যমাণ সাংবাদিক হিসাবে এই এলাকায় উপস্থিত ছিলাম। মিশনারি সাহেবদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক যে কত গভীর, কত দুশ্ছেদ্য আমি তা নিজের চোখে দেখেছি। বৃদ্ধ বা শিশুদের কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল, উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীদেরও হাউহাউ করে কাঁদতে দেখেছি। অক্ষমের সেই কান্না দিল্লির বিরুদ্ধে ক্ষোভ হয়ে এদের মনে জমা হয়ে আছে। ভারতীয় সংবিধানের প্রতি এদের দ্বিধাপূর্ণ আনুগত্যের অনেক কারণ।

অপরদিকে খ্রীস্টধর্মের প্রতি এদের অত্যধিক আনুগত্যের কয়েকটি স্থূলতর কারণ আছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতিরা আজ যতটুকু ঐক্যবদ্ধ তার সবটুকুই ওই খৃষ্টধর্মেব কল্যাণে, কিছুদিন আগেও নাগারা চৌদ্দটি বড় মাপের এবং অনেকগুলি ছোট মাপের হাঁড়িতে ও ভাষায় বিচ্ছিন্ন ছিল—একে অপরের মুণ্ড শিকার করত—এরাই এককাট্টা হয়ে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে শক্তিশালী

ভারতের বিরুদ্ধে একটানা লড়াই চালিয়ে চলেছে। এদের কাছে এনেছে খৃষ্টধর্ম। এদের রাজনৈতিক চেতনার মূলেও আছে খৃষ্টধর্ম। মিশনারিদের কাছেই এদের আধুনিকতার এ-বি-সি-ডি-তে হাতে খড়ি। পাহাড়ের এদিক থেকে এই চেতনাটিকে যতই উদ্ভট, অযৌক্তিক এবং অবাস্তব মনে হোক, পাহাড়ের ওদিক থেকে দেখলে মানতেই হয় যে এমনটি না হয়ে উপায় ছিল না। বর্ণ হিন্দুদের সম্পর্কেও মিশনারিরা উপজাতিদের মধ্যে বিরূপ প্রচার চালিয়ে থাকলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ওই সমাজে মিশনারিরা কোনদিনই দন্তস্ফুট করতে পারেনি, ইংরেজি শিখে ওরা ইংরেজকে তাড়াবার চক্রান্ত করে, বলে বাইবেলের চাইতে গীতা কম কিসে, —এই সব অনুতপ্ত পাপীদের সম্পর্কে দু'কথা বাড়িয়ে বললে তা রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দু'দিক থেকেই লাভজনক হয়। তবে সাহেবরা যতই কুৎসা করে থাকুক আমরা বর্ণ হিন্দুরা গত ত্রিশ বছর ধরে ক্রমাগত প্রমাণ করে আসছি যে আমরাও সেই কুৎসার অনুপযুক্ত নই। খৃস্টের প্রকৃত ভক্তরা ভবিষ্যতের কথা আজকেই বলে দিতে পারে। উপজাতিরা নানা কারণে খৃস্টধর্মের কাছে কৃতজ্ঞ। সেই খৃস্টধর্মের উপরে নতুন কোন বাধা নিষেধ আরোপিত হলেই ওরা আতঙ্ক বোধ করে। আতঙ্ক থেকেই উত্তেজনা এবং সেই থেকেই শান্তিভঙ্গ।

লোকসভায় পেশ করা ফ্রীডম অর রিলিজিয়ান খসড়া আইনটিকে এরা বিশেষ করে খৃস্টধর্মের উপর নতুন নিষেধ আরোপের চেষ্টা বলেই বিশ্বাস করে। বিশ্বাসটি আরও জোরদার হয়েছে, কেননা প্রায় একই সময়ে অরুণাচল বিধান সভায় অনুরূপ একটি খসড়া প্রস্তাব আইন হবার অপেক্ষায় আছে। এই থেকে একটা জিনিস প্রমাণিত হয়ঃ ব্রিটিশরা চলে যাবার পরও, উত্তর-পূর্ব ভারতে খৃস্টধর্মের জয়যাত্রা তেমনভাবে ব্যাহত হয়নি। এর কারণ, ওয়াটসন, একটু পরেই বোঝা যাবে।

এমন সন্দেহ করবার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে অরুণাচলে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত হবার পর এই এলাকার ক্ষমতা কয়েকটি সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতির কুক্ষিগত হয়েছে—এর মধ্যেই যারা একটু সংঘবদ্ধ, যাদের বিষয়বুদ্ধি একটু বেশি তাদের হাতে। নিজেদের হাতে ক্ষমতা ধরে রাখবার জন্য এরা চাইবে না যে অন্যান্য উপজাতি-গুলোও সমানভাবে সংঘবদ্ধ অথবা আলোকপ্রাপ্ত হোক। মিশনারিদের ভয় পাওয়া এদের পক্ষে স্বাভাবিক। ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যই কি এই বজ্র আঁটুনি? তাহলে কিন্তু অরুণাচলের উপজাতিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আস্থা ইত্যাদি পাওয়া আরও অনেককাল পিছিয়ে গেল।

এইবার দেখা যাক এই আইন কেমন করে বলবৎ হতে পারে। সুদূর কোন গ্রামের অতি দরিদ্র এক উপজাতি অবৈধ প্রলোভনে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করল। ধর্মের এই ব্যভিচারে বিচলিত হয়ে কেউ পুলিশের কাছে খবরটি পৌঁছে দেবার জন্য ছুটে চলেছে—এমন দৃশ্য ভাবাই যায় না। কে না জানে যে পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা। কিন্তু তবু পুলিশ কেস হবে অপরের ধর্ম রক্ষা করবার জন্য নয়, অপরের সম্পত্তি গ্রাস করবার জন্য। অরুণাচল থেকে ইতিমধ্যেই চার্চ বিধ্বস্ত হবার এবং কিছু খ্রীস্টান নিগৃহীত হবার অভিযোগ আসছে। মন্ত্রীরা সেসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন—কিন্তু রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের কথা কে বিশ্বাস করে? অরুণাচলের বাইরেও অনেক ভালো ভালো জায়গায় মিশনারিদের অনেক ভালো ভালো জায়গা জমি আছে এবং সেসবের উপর ভালো ভালো লোকের খুব ভালো রকম নজর আছে। নতুন আইনে কেস অনেকই হবে।

এই বিধি-নিষেধের আরেকটি দিক আছে। সকলেরই জানা যে বাইরে থেকে মিশনারিদের কাছে অনেক টাকা আসে। নানা খাতে টাকা আসে। সেই টাকার কিয়দংশ মিশনারিরা শিশুদের মধ্যে দুধ বিতরণ, শীতের সময় কম্বল বিতরণ, স্কুল-ডিসপেনসারি চালানো

ইত্যাদি কাজে ব্যয় করে থাকে। এই ব্যাপারগুলো আসলে খ্রীস্টধর্মের অতি সূক্ষ্ম প্রচার। কিন্তু এইটুকু ভরসা করেই দেশের অনেক শিশু, বৃদ্ধ এখনো বেঁচে আছে। খ্রীস্টধর্মের প্রসার বন্ধ হলে যদি এই টাকাটা কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায় তবে এদেশের অনেক শিশু বৃদ্ধের হাসি মিলিয়ে যাবে। জানি না, শিশুর মুখের হাসির চাইতেও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আরও অনেক দামী জিনিষ!

আরও একটা দিক আছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের তিনটি রাজ্যে —নাগাল্যানড, মিজোরাম এবং মেঘালয়ে—খ্রীস্টানরাই সর্বেসর্বা। প্রশাসনের আগাপাশতলা খ্রীস্টান। অদূর-ভবিষ্যতে এই খৃষ্টান একাধিপত্য ক্ষুণ্ণ হবার বিন্দুমাত্র আশা নেই। ভারতের সঙ্গে এই তিন রাজ্যের এখনো বহু বিষয়ে আপোষ-রফা হতে বাকি। সেগুলো সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে হলে এই খ্রীস্টান নেতৃত্বের সঙ্গেই এক টেবিলে বসতে হবে। ধর্মের উপর বিধি-নিষেধ আরোপের দরুন যদি এঁরা বিরূপ বোধ করেন তবে তার ছায়া সেই টেবিলের উপর পড়বেই। তর্ক করে লাভ নেই; আমাদের মতো সবাই ধর্ম-ব্যাপারটিকে বাইরের ঘরের একটা অল্প প্রয়োজনীয় আসবাবমাত্র বলে মনে করে না। এদের সঙ্গে ভারতের সমস্যাগুলোর এমনিতেই সহজ কোন সমাধান নেই, এরা বিরূপ হলে সেগুলো আরও দুশ্ছেদ্য হবে। তাতে কার কি লাভ? তাছাড়া, এইসব রাজ্যে অখ্রীস্টান উপজাতিদের সংখ্যাও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। নিজেদের ধর্ম আঁকড়ে থাকায় এরা এমনিতেই বহুদূর পিছিয়ে আছে, এদের দারিদ্র্য নিয়ে রূপকথা হয়। খ্রীস্টানরা চটে গিয়ে সামনে পাবে এদেরই—দিল্লীর ধর্মাধিকারীদের নয়—তখন এদের কি হাল হবে? এরা তখন কাকে অভিশাপ দেবে?

যে আইন কোনক্রমেই প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, যে আইন দেশের একটা বৃহৎ গোষ্ঠীকে বিক্ষুব্ধ করে, যে আইন কিছু সংখ্যক

শিশু ও বৃদ্ধের মুখের হাসি কেড়ে নেয়, যে আইন অজস্র ছোট বড় সমস্যার সৃষ্টি করে—সেই আইন তবু আমাদের জারি করতেই হবে?

প্রশ্নটিকে আরেকটু বড় করে ধরা যায়: গোহত্যা বন্ধের জিগির তুলে আমরা মুসলমানদের তাতাচ্ছি, ধর্মীয় স্বাধীনতার ধুয়ো তুলে খ্রীস্টানদের ক্ষ্যাপাচ্ছি, হিন্দী ভাষাকে লেলিয়ে দিয়ে দক্ষিণ ভারতকে বিরক্ত করছি—আমরা কি একথা প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর যে ভারতবর্ষ কোনদিন ঐক্যবদ্ধ ছিল না এবং থাকতে পারে না?

বহিরাগত সমস্যা নিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের সবকটি রাজ্যই ইদানিং খুব বিচলিত এবং উত্তেজিত। সেই উত্তেজনারই সশস্ত্র প্রকাশ ঘটে গেল মিজোরামে। সবকয়টি রাজ্যই—বিভিন্ন ভাষায় —বেশ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে বহিরাগতদের আর আশ্রয়-প্রশয় দিতে তারা নারাজ। দৈনন্দিন লেনদেনে আচার-আচরণে প্রতিনিয়ত গায়ে পড়ে কথাটি মনে করিয়ে দেওয়া হয়।

মেঘালয়ের শিলঙে বেশ কিছুকাল ধরে সন্ধ্যের পর পথে বের হওয়া বহিরাগতরা নিরাপদ মনে করে না। বারকয়েক মারদাঙ্গা হয়ে গেছে—খুনোখুনি পর্যন্ত। সরকারের তরফ থেকে বহিরাগতদের উপর বিবিধ প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। আক্রোশটা তাতে কিছুমাত্র প্রশমিত না হয়ে বরং আরও উদ্বেলিত হয়ে উঠছে, ছড়িয়ে পড়ছে।

নাগাল্যাণ্ড এতকাল এইসব সমস্যার উর্ধ্বে বিরাজ করত। সমুদ্রে যে শয্যা পেতেছে তার আবার শিশিরে কি ডর! কিন্তু সেই নাগাল্যানডের ডিমাপুরেই বিহরাগতদের উপর দিয়ে কিছ্‌দিন আগে একটা প্রচণ্ড ঝটিকা বয়ে গেছে। বেশ কিছু হতাহত হয়েছে, ঘর-দোকান পুড়েছে কিছু কিছু, –কিন্তু একেবারে চুরমার হয়ে গেছে বহিরাগতদের পায়ের তলার মাটি। আবহাওয়া এখন শান্ত :আছে —ভগবান করুন যেন তাই থাকে –কিন্তু ঘরপোড়া গরুরা আর তাতে ভরসা পায় না।

ত্রিপুরার বহিরাগত সমস্যাটা সম্পূর্ণই ভিন্ন ধরনের। কিন্তু সেখানেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সজাগ রাখা হয়েছে। মিজোরামের বহিরাগতরা যেহেতু বিদেশাগতও বটে—এবং ভিন্নধর্মী, বৌদ্ধ—আর তাদের .বিচরণক্ষেত্র যেহেতু সুদূর পার্বত্য চট্টগ্রামের সুদর্শন

প্রান্তসীমা—সেজন্য এ ব্যাপারে আমরা নিজেদেরকে সংশ্লিষ্ট মনে করি না।

মনিপুরে বহিরাগতদের উপরে মাঝে-মাঝে মারদাঙ্গা করাটা একরকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কথায় কথায় বহিরাগতদের অপমানিত করে, অন্ধকারে পেলে দু-চার ঘা বসিয়ে দিয়ে, অভ্যাসটিকে ক্রমাগতই সক্রিয় রাখা হয়।

অরুণাচলে রোগটা এখনো তেমন ছড়ায়নি। এই সেদিন পর্যন্তও প্রায় সে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ছিল তো; তাই এখানো এ-সব সূক্ষ্ম ব্যাপার ঠিক রপ্ত করে উঠতে পারেনি। তবে অরুণাচল প্রশাসন খুব সজাগ আছে—শিগগিরই মেকআপ করিয়ে দেবে। সেই সম্মিলয়ের আগে বহিরাগতদের এখন সেখানে একত্র করা হচ্ছে। ইন্ধন জড়ো করা থাকলে তারপর আগুন একদিন লাগবেই।

আসামের কেস সবচাইতে পুরানো এবং ততোধিক জটিল। সেখানে বহিরাগতদের হানা চলছে শতাধিক বর্ষ আগে থাকতে। প্রতিরোধও ছিল গোড়া থেকেই—সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় তার অনেক জ্বালাময়ী বিবরণ ভবিষ্যৎকালের জন্য সঞ্চিত করে রাখা আছে। দাপটটা তখন ভাষার উপর দিয়েই যেত, পিঠের উপর এসে পড়ত না। পরবর্তীকালে রেলগাড়ি হবার পর বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ যখন অনুপ্লাবনে রূপান্তরিত হল, এবং তারও পরে দেশ-বিভাগের পর যখন তা আণবিক প্রলয়ের রূপ ধরল তখন আসামকেও কঠোর থেকে ক্রমে কঠোরতর হতে হয়েছে। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর—কিছুদিন পর পরই—ভাষা আন্দোলনের নামে যে জিনিস চালানো হয়ে আসছে সেটা আসলে বহিরাগতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। কোনরকম ভণিতা বা কপটতা না করে আসাম বারম্বার জানিয়ে দিয়েছে যে বহিরাগতের চাপে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত,—যা অস্বীকার করবার উপায় নেই,—এবং সে এবার মুক্তি চায়: প্রয়োজন হলে রক্তের বিনিময়ে। রক্তপাত বিস্তর হয়েছে কিন্তু রোগের কোন উপশম হয়নি।

এইবারে দেখা দরকার যে এই বহিরাগতরা আসলে কারা? কোথা থেকে, কবে কেন কি অবস্থায় এরা এতদঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে? স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে এরা কেন এমন বিপজ্জনক রূপে ব্যর্থ হল? এসব কথা খুব স্পষ্ট করে জানা না থাকলে পরস্পারের উপর দোষারোপ করতে গিয়ে যেমন ন্যাজে-গোবরে হতে হয়, তেমনি আবার সমস্যাটার প্রকৃত স্বরূপটাও সঠিক বোঝা যায় না।

সেই সঙ্গে এই ইতিহাসটুকু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভারতের এই উত্তর-পূর্বাঞ্চল অতিক্রম করে আবহমান কাল ধরে একটা জনস্রোত বয়ে চলেছে। স্রোতটি পশ্চিম-বাহিনী—পুব থেকে ক্রমাগত পশ্চিম দিকে বয়ে বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ পেরিয়ে ভারতদেহে লীন হয়েছে। উজান যাত্রী ছিল না বললেই চলে। এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি তার অন্যতম কারণ—মশা, বৃষ্টি, ভূমিকম্প, বন্যা, উটকো সব অধিবাসী, –সুজলা সুফলা দেশ ছেড়ে তখন কে এদিকে আসে! ব্রিটিশরা এসে চাকা ঘুরিয়ে দিল। এবারে শুরু হল পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যাত্রা। ইতিহাস তখনো এখানে পায়ের তলায় শক্ত মাটি খুঁজে পায়নি—এমন সময়ে এই বিপর্যয়।

এই বিপর্যয়ের জন্য যাদের সোপর্দ করা হয়েছে তাদের মধ্যে আছে বাঙালী, নেপালী এবং মাড়োয়ারী পানজাবী সিন্ধী ইত্যাদি ভাগ্যান্বেষী গোষ্ঠী। শেষোক্ত খুচরোদের কোন সুনির্দিষ্ট সুচিহ্নিত ভূমিকা নেই—এরা সংখ্যায় এখনও ভীতিপ্রদ নয়, তাছাড়া এদের টাকার জোর আছে যা দিয়ে এরা অতি সহজেই উগ্রপন্থীদের শীতল করে দিতে পারে--এদের কাছে ব্যাপরটা একটা অক্যুপেশনাল হ্যাজার্ড, পয়সা রোজগার করতে হলে সইতে হবে। নেপালীদের ক্রিয়া-কলাপও এখনো পর্যন্ত আসাম, মেঘালয় ও অরুণাচলের গ্রামাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ আছে। গোয়ালা ও পশুপালক রূপে এরা তিনরাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, স্থানীয়

অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে, উপজাতি সমাজব্যবস্থার উপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চল সম্পর্কে আমাদের জাতীয় সংবাদ-পত্রগুলির কৌতূহল যেহেতু সীমিত—এই ঘটনাগুলো তাই এখনও নীরবে ঘটে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতেই বিস্ফোরণ যেদিন ঘটবে সেদিন হেড-লাইন হবে।

বাকি রইল শুধু বাঙালী—এর ইতিমধ্যেই অজস্রবার প্রাণদণ্ড হয়ে গেছে এবং আরও অজস্রবার হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু অভিযুক্তর পরিচয়টা আরেকটু ভালো ভাবে জানা দরকার। স্বাধীনতার অনেক আগে, শাদুল্লার অকপট সহায়তায়, বাংলাদেশ এলাকা থেকে বাঙালী মুসলমানরা লাখে লাখে আসামে এসে বসবাস করতে থাকে—স্বাধীনতার পরেও এই ধারাটিকে অব্যাহত বইতে দেওয়া হয়। এরা খেত-খামারির কাজে পাকা, রাজনীতি নিয়ে সচরাচর মাথা গরম করে না, মাতৃভাষা হিসেবে অম্লান-বদনে অসমীয়া লিখিয়ে দেয়, নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের বাকসে ভোট ফেলে। আর কিছু না হোক স্রেফ সংখ্যার জোরে এদের সামগ্রিক প্রভাব যেদিন সম্পূর্ণ রূপে আসামের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে সেদিন আবার সাঁকো নড়বে- ফিউজ পুড়ছে। জাতীয় সংহতির অং-বং-চং সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতার ভূত এখনো সর্বত্রই বেশ বহাল তবিয়তে আছে। কিন্তু সেসব চিন্তা ভবিষ্যৎ বংশধরেরা করবে? এখনো পর্যন্ত এদের শ্রমের মুনাফাটাই বড় কথা। অতএব বহিরাগত বাঙালী বললে এরা এখনো তার মধ্যে পড়ে না।

বহিরাগত বাঙালী বলতে বোঝায় বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দু—এই চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে-মিত্র বোস-বসাক-পোদ্দার ইত্যাদি। গ্রামাঞ্চলে এদের তেমন সাক্ষাৎ মেলে না। এরা থিক-থিক করছে ছোট বড় হঠাৎ গজিয়ে ওঠা শহর এলাকায়। এদের নিজেদের ঘরে শান্তি নেই, তাই এরা পাড়া-পড়শীর শান্তিভঙ্গের কারণ হয়। মাঝে মাঝে খুব খোলাই খায়। তারই মধ্যে আবার নববর্ষ করে, দুর্গোৎসব

আর রবীন্দ্রোৎসব করে। ব্যাংক, ইনস্যুরেনস এবং অপরাপর কেন্দ্রীয় দফতরগুলোতে এদের একাধিপত্য অনেকটা খর্ব করা হয়ে থাকলেও এখনো মোটামুটি বহাল আছে। এদের ছেলেমেয়েরা কোথায়ও কর্মখালির সম্ভাবনা নেই জেনেও সেখানে গিয়ে ভিড় করে—স্থানীয় মৃত্তিকাজাতরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। স্থানীয় উৎসবাদিতে এরা আমন্ত্রিত হয় না, অংশ গ্রহণও করে না। স্থানীয় সবকিছুর প্রতিই এদের একটা তাচ্ছিল্যের ভাব আছে; ক্বচিৎ কখনো বা অত্যুৎসাহে রূপান্তরিত হয়ে অধিকতর ক্ষতির কারণ হয়। স্থানীয় লোকেরা এদের কাছে ঘেঁষতে পারে না, অতএব দূর থেকে চুটিয়ে ঘৃণা করে। দূরত্বটা যখন যেখানে যতটুকু কমে আসছে তখন সেখানে ঠিক সেই মাত্রায় সংঘর্ষ ঘটছে।

ভারতের এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাঙালী বাবুরা প্রথম প্রাদুর্ভূত হন গত শতকের শেষার্ধে। ততদিনে বেশ ভালো করে ব্রিটিশ রাজ কায়েম হয়েছে, চা-বাগানের পরিধি বাড়ছে, রেল লাইন পাতা হচ্ছে, ডাক ও তার বিভাগের শিরা-উপশিরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এইসব কাজ চালাতে চালাক-চতুর, অনুগত কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে তখন তার প্রচুর যোগান--বিশ্ববিদ্যালয়ের চোলাই করা, সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। আসামে বাঙালীবাবুর প্রথম প্রাদুর্ভাব ঔপনিবেশিক শক্তির অনুচর হিসাবে। সেই কালিমা সহজে ঘোচে না। ব্রিটিশদের যাবতীয় কুকাজ এদের হাত দিয়েই হত, তার উপরে ছিল এদের নিজস্ব পার্সেনটেজ,—আক্রান্ত, নির্যাতিত, পরাজিত, অপমানিত স্থানীয় অধিবাসীদের সমগ্র ঘৃণা ও আক্রোশ পুঞ্জীভূত হয়েছে ওই বাঙালীবাবুটির বিরুদ্ধে। অনেক ধুয়ে যাবার পরেও সেই ঘৃণা ও আক্রোশের অনেক এখনো অবশিষ্ট আছে।

এই বাঙালীবাবুরা যে এমনিতে খুব খারাপ লোক ছিলেন তা নয়, তবে রাজার নিজস্ব অনুচর হিসাবে সেখানে যেটুকু সুবিধা গ্রহণ করবার তা তারা গ্রহণ করতেন। স্থানীয় লোকদের মনুষ্যেতর জীব

বলে বিবেচনা করবার রেওয়াজও ততদিনে সরকারী আমলাদের মধ্যে চালু হয়ে গেছে। গ্রামের ছেলেটিকে চাকরি-বাকরি দিয়ে কোথায়ও বসিয়ে দেওয়াটা তখন সামাজিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। ব্রিটিশ আমলে বৃহত্তর আসামের সমগ্র প্রশাসন ছিল বাঙালীবাবুদের একটি দুর্ভেদ্য দূর্গ।

কিন্তু বাঙালীবাবুরা কেবল রাজত্ব মানে দাসত্বই করতেন না। তারা শিক্ষাভিমানী ছিলেন এবং যেখানেই সুযোগ হয়েছে সেখানে একটি করে বাঙালী স্কুল করেছেন। সেসব স্কুলে অসমীয়াদেরও শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ ছিল। এরা সংস্কৃতিবান ছিলেন – বর্ষোৎসব, দুর্গোৎসব ইত্যাদি করতেন। বাঙালী সংস্কৃতির জেল্লায় আসামের লোক-সংস্কৃতি কোণঠাসা হয়ে পড়ল। পরবর্তীকালে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দীপ্তি ও প্রভাব অসমীয়া সাহিত্যের প্রচুর ক্ষতি-সাধন করেছে। বাংলা চলচ্চিত্রে এমনভাবে আসর মাত করে রেখেছে যে অসমীয়া চলচ্চিত্রের আজ হুঁকো মেলেনি। অসমীয়া লোক-সঙ্গীতের সুরে বাংলা গান গেয়ে অনেক বাঙালী গায়ক ভারত-জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে—কিন্তু আসামের কাছে কোনরূপ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়নি। এইসব অত্যন্ত গভীরের ক্ষত, সহজে নিরাময় হয় না।

অবশ্য এই সবকিছুর জন্যই বাঙালীকে দোষী সাব্যস্ত করলে সুবিচার করা হয় না। বহুবিধ ঐতিহাসিক দুর্বিপাকে ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম আধুনিকতার প্রচলন হয় বাংলাদেশ। সেই সময়ে কয়েকজন ক্ষণজন্মা বাঙালীর আবির্ভাব ঘটায় ঘটনা আরও জটিল হয়। এদিকে অসমীয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সুদীর্ঘকালের আত্মীয়তা।—জ্ঞাতিভাইদের একজন হঠাৎ কিছুটা এগিয়ে গেলে অন্যান্য জ্ঞাতিভ্রাতাদের তাতে গাত্রদাহ মর্মদাহ হতেই পারে। তাতে তাদের নিজেদেরও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

তাছাড়া বাঙালীর প্রথম দিকটায় ঠিক সাধ করে আসামে আয়নি। পূর্বদেশ জয়ের উদ্দেশ্যে কোন সাংস্কৃতিক অভিযানের বিজয়-কেতন উড়িয়ে এরা আসামে পৌঁছায়নি, নিতান্তই ঘটনাচক্রে হাজির হয়েছে। এদের সংস্কৃতিবোধের চাইতে যে বিষয়বোধটা অনেক বেশি সূক্ষ্ম ছিল, তার কিছু কিছু প্রমাণ আজও অবশিষ্ট আছে। আরও একটা কারণে এরা একটুখানি করুণা প্রত্যাশা করতে পারে। অসমীয়াদের সঙ্গে আধুনিকতার পরিচয় ঘটেছে এই বাঙালীবাবুদের মধ্যস্থতায়। তার লাভ-লোকসান আসামের খাতায়ও জমা হচ্ছে। যে আমলা-প্রধানের নামে আজ বহিরাগত বাঙালীর পিলে চমকে ওঠে তারও আমলাতন্ত্রের হাতেখড়ি হয়েছে কোন বাঙালী আমলার তত্ত্বাবধানে। মানুষের স্বভাবই এই: উপকারীকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। অতএব অসমীয়া ও বহিরাগত বাঙালীদের মধ্যে একটি দীর্ঘ সাঁড়াশী সংঘর্ষ কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্তই ছিল। সাহেবরা চলে যেতেই কাজ শুরু হয়ে গেল।

এর মধ্যেই আবার আরেক দুর্বিপাক। দেশ স্বাধীন হল, দেশ বিভাগ হল। পূর্ব-বাংলার তাবৎ মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজ, প্রায় এক লপ্তে, এদেশে চলে এল। অধিকাংশই গেল পশ্চিমবঙ্গে, আসামেও এল অনেকে। আসামের রাজনৈতিক নেতারা সেই সময় সিলেট জেলাটি খুব আগ্রহের সঙ্গে পাকিস্তানকে দান করেছিলেন, ভেবেছিলেন পাপ বিদায় হল। কিন্তু পাপ কি আর অত সহজে বিদায় হয়! দেশ বিভাগের পরে পরেই সিলেটের সম্পূর্ণ বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজটি আসামে এসে আশ্রয় নিল। অপরদিকে দেশ স্বাধীন হয়েছে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভাগ্যান্বেষীরা উড়ে আসতে শুরু করল।

এই চাপ আসাম সহ্য করতে পারলনা। অন্য কেউই পারত না। বাঙালীবাবুদের উপর ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আরও অজস্র কারণে আসামের গোড়া থেকেই একটা

আক্রোশ ছিল। তার উপর আসামও এখন স্বাধীন, অনায়াসপ্রাপ্ত ক্ষমতার দাপটই আলাদা। আক্রোশটা মাঝে মাঝে দপ করে জ্বলে উঠতে শুরু করল। তবু কপাল ভাল যে রাজনৈতিক দাদারা ছিলেন এবং আছেন। এত বিক্ষোভ, এত উত্তেজনা - এক পক্ষ শক্তিশালী, অপর পক্ষের পালিয়ে যাবার কোন চুলো নেই—আবার উভয় পক্ষেরই ভোট আছে—দাদারা কাজ দেখাবার একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলেন। এখনো সেই ভাঙিয়েই অনেকের চলছে। রাজনৈতিক প্রয়োজন মতো আক্রোশের মিটার বাড়ানো কমানো হয়। দাঙ্গা থামানো হয়। ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিরাও দরকার মতো এই আক্রোশটিকে কাজে লাগান। ক্রেতা বা শ্রমিকদের কোন আন্দোলন চাপা দিতে হলে একপক্ষের বিরুদ্ধে আরেক পক্ষকে একটু সুড়সুড়ি দিয়ে দাও। ১৯৭৩।৭৪-এর ভাষাদাঙ্গার সময় একজন অতি উদার মন্ত্রীকে দেখেছি, মাত্র আধ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানে, বিবদমান দুই পক্ষকেই অর্থ সাহায্য দিয়েছেন। এখবর সেই সময়ের একটি দৈনিকে ছাপা হয়েছিল, মন্ত্রী মহোদয় কোন প্রতিবাদ করেননি।

একদিকে অসমীয়াদের অস্তিত্বের সংকট অপরদিকে বাঙালীরাই বা যায় কোথা? কেউ কেউ বলে এই বাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা দায়িত্ব আছে। তা যে আছে তার প্রমাণ এই যে, ডাক পড়লেই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী এসে হাজির হয়।

একথা সত্য এই সমস্যার একেবারে সূত্রপাত থেকে আজকের সবনাশে সমুৎপন্নে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এ-ব্যাপারে এক নিষ্ঠুর নিরপেক্ষতা বজায় রেখে আসছে। ব্রিটিশ আমলে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, কিন্তু দেশ-বিভাগটি তো নিজেদের কর্ম। দেশ-বিভাগের পরে এরা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে এসে আসামের আকাশ কালো করে তুলল কেন্দ্রীয় সরকার তখন নিরপেক্ষ নয়নে তা অবলোকন করেছে —রা কাটেনি। দুটো পরস্পরবিদ্বেষী তিক্ত-ক্ষুব্ধ সম্প্রদায়কে রাম নাম নিয়ে একই কামরায় থাকতে দেওয়া হল—যে কামরা থেকে

বেরোবার দরজা নেই। এমন অবস্থায় কী ঘটতে পারে তা বুঝবার জন্য রাষ্ট্রনীতিতে পণ্ডিত হবার প্রযোজন হয়না—কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতারা দৃঢ়তার সঙ্গে নিরপেক্ষতা আঁকড়ে রইলেন। থেকে থেকে যখন বিস্ফোরণ ঘটে কেন্দ্রীয় সরকার তখন প্রথমটায় গুম মেরে গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে, তারপর মিহি থেকে মোটা কতগুলো হুংকার ছাড়া হয়, অবস্থা বেগতিক হলে দু-চার জন মন্ত্রী ঝটিকা সফর করে যান, চূড়ান্তে পৌঁছে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটনা যখন আবার শান্ত হতে শুরু করে তখন একটি পর্যবেক্ষক দল খুব গম্ভীর মুখে এসে খানা-পিনা করে যায় —ততদিনে হামলাকারী দু'পক্ষেরই দম ফুরিয়ে গেছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার আজও পর্যন্ত 'শিক্ষার মাধ্যম' নিয়ে একটা রাষ্ট্রীয় নীতি স্থির করে উঠতে পারেনি।

এই সব কথাই ঠিক, সব কয়টি ধারায়ই কেন্দ্রীয় সরকারের ফাঁসির হুকুম হতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রায় সবকারকে ফাঁসি দিলেই কি এই সমস্যার কিছুমাত্র সুরাহা হবে? তাব বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। আবও অনেক আগে চেষ্টা কবলে কি ঘটত বলা শক্ত, জট এখন এমনই জটিলভাবে পাকিয়েছে যে বর্তমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থাব ওই জট ছাড়বাব সম্ভাবনা খুবই সুদূব। ইতিহাসের নৃতত্ত্বের, ভাষাতত্ত্বের যে সুদীর্ঘকালীন লড়াই, সে লড়াই চলবেই - সেজন্য শান্তিভঙ্গ হবে, তবুও চলবে—সে লড়াই থামানো যায় না, থামানো উচিত নয়। কিন্তু সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে এই বিদ্বেষে উস্কানি দিয়ে অশুভ শক্তিরা ফায়দা তুলতে না পারে। অযথা সংঘর্ষে বিবর্তনের ধারাটি যাতে বিপথগামী হয়ে আরও বেদনাদায়ক না হয়ে ওঠে। কিন্তু শক্তিমানেরা খুবই শক্তিমান, আর তাদের উপর যারা নজর রাখবে তাদের ভাও কত?

এমতাবস্থায় আসামের বহিরাগত সমস্যার আশু কোন সমাধান আছে বলে যারা আশা করেন তারা হয় মেঘলোকে আছেন, নয়তো তাদের কোন ধান্দা আছে। মিথ্যা আশার চুষিকাঠি চুষে তো ত্রিশ

বছর কেটে গেল—এবারে একটু সাহস করে নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি হওয়া দরকার। উভয় পক্ষই যখন জানতে পারবে যে লড়ায়ের আসল ক্ষেত্র কোনটা, তখন আর পথিপার্শ্বের খুচরো দাঙ্গা-হাঙ্গামায় কেউ শক্তিক্ষয় করবে না। তন্মধ্যে আসামে আরও অনেক ভাষা-দাঙ্গার সম্ভাবনা রইল; কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী যেন সজাগ থাকে।

আসামের বহিরাগত সমস্যাটি যত জটিল এবং পুরানো, উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের অবস্থা কিন্তু ততটা মুমূর্ষ নয়। নাগাল্যানডে ও মিজোরামে বহিরাগত বলতে প্রধানত বোঝায় উত্তর ভারতীয় ব্যবসায়ী, পানজাবী ঠিকাদার এবং নেপালী দিনমজুর। নেপালীরা যেখানে যায় সেখানেই রাতারাতি শিকড় চালিয়ে দেয়—কিন্তু নেপালীরা না হলে রাস্তা বানাবে কারা? ব্যবসায়ী আর ঠিকাদারেরা সংখ্যায় অল্প হলেও দুর্নীতির প্রস্রবণ। স্বয়ংসিদ্ধ উপজাতিরা এদের বড় ভয় পায়। এছাড়া একেবারে সীমান্ত এলাকার কোন কোন জায়গায় কিছু কিছু ঝুট-ঝামেলা আছে, বড় কোন সমস্যা নেই। তবে মেঘালয়ের গ্রামাঞ্চলে নেপালীরা বেশ বিপদজনকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে মেঘ সঞ্চার হয়েছে, হচ্ছে, এরপর যে কোনদিন বজ্র-বিদ্যুৎ সহ । সে যখনকার কথা তখন, ইতিমধ্যে মেঘালয়ের সবচাইতে বড় উদ্বেগ শিলঙের কতিপয় বহিরাগতদের নিয়ে সেনা-বাহিনীর উদ্ধত উপস্থিতি যে উষ্মা ও বিদ্বেষ খুঁচিয়ে তোলে সেটুকুও ওই বেচারা কতিপয়ের মাথায় চাপান হয়। বহিরাগতদের নিয়ে এদের এত উচ্ছ্বাসের কারণ—ভয়। পুরাতন নূতনকে ভয় পায়, রক্ষণশীল পরিবর্তনকে ভয় পায়, চোখ ধাঁধানো আধুনিকতাকে ঐতিহ্যাশ্রয়ী উপজাতি সমাজ ভয় পায়। এই ভয় অস্তিত্বের ভয়। অস্তিত্বের সংকটটা সোজাসুজিও আসতে পারে—যেমন ত্রিপুরায় এসেছে—আবার সূক্ষ্ম পথেও আসতে পারে—যাকে বলে সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ—যাতে করে নিজস্ব সবকিছু মরে যায়।

সে যাই হোক, উপজাতিরা সজাগ আছে, আসামও। বহিরাগতদেরও পিঠ যে দেওয়ালে ঠেকে গেছে—মেরুদণ্ডটায় ফাটল ধরেছে—তা এরা জানে। তবু মাঝে মধ্যে হাই হুই করে আবার নতুন করে দেওয়ালে ঠুসে ধরে—ওটা গা গরম রাখবার জন্য।

কিন্তু বহিরাগতদের কি বক্তব্য? এদের কাহিনী সত্যই বড় করুণ, বড় নিষ্ঠুর—কিন্তু সে কাহিনী শুনে শুনে সকলেরই কান পচে গেছে। এইটুকু শুধু উল্লেখ করা দরকার যে ইতিহাস এদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ রেখেছিল এরা তার মোকাবিলা করতে পারেনি, করবার চেষ্টাই করেনি,—গোড়া থেকেই এরা পরাজয় স্বীকার করে বসে আছে। ইতিহাস যতবার এদের কাছে পৌরুষ দাবি করেছে, এরা ততবারই হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠেছে! নিজেকে—স্রেফ নিজের পরিবারটিকে—বাঁচাবার বৃথা—চেষ্টায় হেন অপমান নেই যা এরা সয়নি। দালালি করেছে, দুষ্কৃতকারীকে ভোট দিয়েছে—শুধু একটু বেঁচে থাকবার জন্য। অতীতটা (রাজা রামমোহন রায় থেকে সবকিছু) এদের কাছে চোরাই মালের মতো, ভবিষ্যৎটা গাঢ় অন্ধকার,—পরবর্তী দুরমুশের আগে ওরা এখন নিজেদের একটু সামলে নিচ্ছে।

শিলঙের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই কিছুকাল আগে বলেছিলেন: উপজাতিদের স্বার্থ যাতে কিছুতেই ক্ষুণ্ণ না হয় তা দেখতে হবে; সেই সঙ্গে কেউ যাতে সংবিধান প্রদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তা-ও দেখতে হবে। শ্রীদেশাই-এর এই ডিম না ভেঙে ওমলেট খাবার প্রস্তাব উপস্থিত সকলেই করতালির দ্বারা সমর্থন করে।

আকাশে মেঘ না ডাকতেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মানুষের বুক দুরুদুরু করে ওঠে ঃ ওই বুঝি তেড়ে এল অন্ধ জলরাশি ; নিয়ে গেল ভাসিয়ে ঘর-বাড়ি, মানুষ-জন। কিন্তু অনেকের সর্বনাশে কারো কারো পৌষ মাস। ব্রহ্মপুত্র আর তার চেলারা বছর বছর নতুন সর্বহারা তৈরি করে দিয়ে যায়। পাশাপাশি কিছু ধনী আরো ধনী হয়। কী করে—জানাচ্ছেন ধ্রুব মজুমদার।

আসামে বর্ষার আরেক নাম বন্যা। বন্যার আরেক নাম সর্বনাশ।

আসামে বন্যা হয় প্রায় প্রতি বছর। কোন বছর ক্ষুদ্রাকারে। প্রায় বছরই প্রলয়াকারে। যদি কেবল কয়েক শ' মাইল এলাকা জলমগ্ন এবং কয়েক শ' মাত্র লোক বাস্তুহারা হয়—তবে সেটাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সেটা নিঃশব্দে ভুক্তভোগীর উপর দিয়েই যায়।

প্রায় বছরই বন্যা আসে প্রলয়ের মূর্তি নিয়ে। হাজার হাজার মাইল খেত-খামার ডুবে যায়, ভেসে যায় হাজার হাজার গ্রাম, জনপদ। মারা পড়ে মানুষ-জন, গরু-বাছুর। লাখ লাখ মানুষ নিরাশ্রয় নিঃসম্বল হয়ে সরকারী লঙ্গরখানায় ভিড় করে। কত পরিবার ভেঙে যায়, কত মা সন্তান হারায়, স্ত্রী হারায় স্বামী। মানুষ যে কত দুঃখ সইতে পারে তা দেখতে হলে ব্রহ্মপুত্রের বন্যার্তদের দেখতে হয়।

সেই অনাদিকাল থেকে এই স্বাধীনতার তিরিশ বছর পর পর্যন্ত মোটামুটি একই ধারা চলে আসছে। আসামে বন্যার ধ্বংসলীলা একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। ঘটনাগুলো পর পর ঘটতে থাকে। বার্তা এলেই বিরোধীপক্ষের রাজনৈতিক নেতারা

সমস্বরে কাঁদতে শুরু করে : সব ভেসে গেল, উদারহস্ত রিলিফ চাই। সরকার পক্ষ তখন বন্যার দোষ ঢেকে বলেন : না না তেমন মারাত্মক কিছু নয়। ইতিমধ্যে যাদের ভোগবার তারা ভুগতে শুরু করেছেন।

কিন্তু ডিব্রুগড়, তেজপুর কিম্বা গৌহাটিতে ব্রহ্মপুত্রের জলরেখা বিপদ-সীমা ছাড়িয়ে গেলে চারদিকে হঠাৎ খুব হৈ হৈ পড়ে যায়। সরকারী হ্যানড-আউট তর্জমা করে সাংবাদিকেরা লম্বা লম্বা রিপোর্ট পাঠান, বড় বড় হরফের শিরোনাম দিয়ে তা ছাপা হয়। বন্যায় কত হাজার মাইল ডুবল, কত লাখ টন শস্য নষ্ট হল, কয় লাখ লোক নিরাশ্রয় হল, তাদের জরুরী সাহায্যের জন্য কত টাকা দরকার, পুনর্বাসনের জন্যই বা কত—এইসব তথ্যে সরকারী হ্যাণ্ড-আউট ভরে ওঠে। সবই হল দিললির উপর যথাসময়ে চাপ সৃষ্টির প্রস্তুতি। কান্নাটা যত জোর হয়, নাড়ুও তত বেশি পাওয়া যায়।

বন্যার তোড়ে একাধিক জেলা বিপন্ন হলে—তার আগে যার-যার তার-তার সেনাবাহিনীকে তলব করা হয়। সামরিক কেতায় সরেজমিন পরিদর্শনের পর আজ পাগলাডিহিতে দু'টি, দশদিন পর স্বর্ণসিরিতে চারটি রাবারের ডিঙ্গি নামানো হয় ত্রাণ কাজের জন্য। রিপোর্ট ও ছবি সংবাদপত্রে ছাপা হতে থাকে। অতঃপর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অথবা রাজ্যপাল প্রেস-পার্টি নিয়ে হেলিকপটারে চেপে বন্যার তাণ্ডবলীলা, আশ্রয়-শিবির এইসব দেখতে বের হন। আশ্রয়-শিবিরগুলো হিউম্যান স্টোরির আড়ৎ বিশেষ। এত করেও ব্রহ্মপুত্র সংহত না হলে অনেক ধরা-করা করে দিললি থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আনানো হয়। তার সঙ্গে আসেন রাজধানীর খানদানী সাংবাদিকেরা।

একে একে এইসব সুলক্ষণ দেখা গেলে রাজ্যের সংসদ সদস্য ও তাদের চেলা-চামুণ্ডারা কোমর বেঁধে কাজে লেগে যান—প্রত্যেকেরই এলাকায় সব চাইতে বেশি রিলিফের বরাদ্দ চাই। এই সন্ধিক্ষণে দরকার পড়লে এমন কথাও বলতে হয় : না, অন্য কোন জায়গায়

আসলে তেমন কিছু হয়নি। চেষ্টা করলে দু-একজন সাংবাদিকেরও সহায়তা পাওয়া যায়। ওদিকে রিলিফের টাকাটা যাতে ঠিক ঠিক চ্যালা-চামুণ্ডার মারফৎই খরচ হয় সেদিকেও নজর রাখতে হয়। বন্যাত্রাণ নামে এই বাৎসরিক মচ্ছবটি আসামে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

ওদিকে বন্যা হয়তো একের পর এক লোকালয় গ্রাস করে চলেছে। লঙ্গরখানা উপছে পড়ছে, একশ জনের লপসি পাঁচশ জনকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। আশ্রয় শিবিরের সামনে রাইফেল-বেয়নেট নিয়ে পুলিশ পাহারা বসানো হয়েছে, যাতে বন্যাক্লিষ্ট ছাড়া অন্য ক্যাটেগরির 'নিরাশ্রয়' শিবিরে ঢুকে না পড়ে।

লঙ্গরখানাগুলোর অবস্থা কেমন? নিজের চোখে দেখেছি: তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে ব্রিটিশ লঙ্গরখানার অবস্থা এর চাইতে অনেক বেশি সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যসম্মত ছিল। আশ্রয় শিবিরগুলো? মানুষের বদলে শুয়োর রাখলে দৈনিক প্রতি শিবিরে দেড় ডজন করে মারা যেত।

এই তো বন্যার চলতি চেহারা। কিন্তু তারপর? যার যতটুকু সঞ্চয় সব খোয়া গেছে। পেছন দিকটা খাঁ খাঁ। সামনের দিকে পুঞ্জীভূত অনিশ্চয়তা—আদিগন্ত বিস্তৃত। বানের জল প্রাকৃতিক নিয়মেই একদিন নেমে যাবে। তখন এরা এদের কোন ছন্নছাড়া দেশ-গাঁয়ে ফিরে যাবে? ঘর নেই, বাড়ি নেই, গরু নেই, মোষ নেই, খেত নেই, লাঙল নেই। রিলিফবাবুরাও এই আছে তো এই নেই। তবে মহাজন আছে। প্রতিবার বন্যার পর আসামে ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা কত বৃদ্ধি পায় তার একটা সমীক্ষা করা দরকার। বন্যা আসামের অর্থনৈতিক চেহারা ও সামাজিক অবস্থা পালটে দিচ্ছে। কিছুদিন আগেও বন্যার্তদের জন্য কিছু কিছু সামন্ততান্ত্রিক আশ্রয় অবশিষ্ট ছিল। স্বাধীনতার আগে বন্যাত্রাণ কমিটি ও স্বাধীনতার পরে সরকারী রিলিফ সে সব ধুয়ে-মুছে দিয়েছে। এখন ভরসা

স্বভাবই প্রশ্ন উঠতে পারে : ব্রহ্মপুত্রকে কি বশে আনা যায় না? এতদিন এ-প্রশ্ন ওঠেনি কারণ তা তোলবার সুযোগ ছিল না। একমাত্র প্রতিকার ছিল আরও একাগ্রতার সঙ্গে হরি-সঙ্কীর্তন করা। কিন্তু আজ আমেরিকায়, ইউরোপে, রাশিয়ায় বহু দুর্দম নদ পরাজয় স্বীকার করেছে, এমন কি চীনের হোয়াং-হো বা ইয়াং-সে নদ মানুষের সেবায় নিয়োজিত - তখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে : ব্রহ্মপুত্রকে কি বশে আনা যায় না? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট জবাব : না।

ভূগোলের দিকটাই আগে দেখা যাক। পশ্চিম তিব্বতে মানস সরোবরের কাছাকাছি এলাকা থেকে ব্রহ্মপুত্রের যাত্রা শুরু। আড়াআড়িভাবে তিব্বত অতিক্রম করে টানা `-৫০ কিলোমিটার —ডিবং ও ডিহং এই দুটি স্রোতধারায় বিভক্ত হয়ে অরুণাচলের পূর্বসীমা ঘেঁষে আসামে নেমেছে। তারপরে আবার আরও আটশ কিলোমিটার এগিয়ে বাংলাদেশে যাত্রা শেষ। এই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার সময় অজস্র ছোটবড় শাখানদী এসে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই শাখানদীগুলির মধ্যে ভারতের দিকে আছে সুবনসিরি, বরালি, মানস, ধানসিরি, বুড়ি, ডিহিং, পাগলাডিয়া। এরা অনেকেই সম্পূর্ণ নিজ দাপটে ভারত সরকারের পিলে চমকে দিতে পারে। ব্রহ্মপুত্রকে পোষ মানাতে হলে তার আগে এইসব খুদে-দানবগুলোকে পোষ মানাতে হবে। সেটা একটু কঠিন কাজ। অরুণাচলের হিমালয় এখনও অপেক্ষাকৃত নবীন বয়স্ক, এখনো স্থির হয়ে বসতে পারেনি। প্রতি বর্ষায় এখানে ধ্বস নেমে এলাকার ভূগোলটাই পালটে দেয়; নদীর গতিপথের কোন ঠিক-ঠিকানা থাকে না। কোথায় বাঁধ দিয়ে এদের জব্দ করা হবে? আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যায় নিশ্চয়ই এইসব চঞ্চলমতিকেও সুগৃহিণী করে তোলার ব্যবস্থা আছে

—কিন্তু সেই ব্যবস্থা আরও দীর্ঘদিন ভারতের আয়ত্তের বাইরে থাকবে।

অন্য অসুবিধাও আছে। চীন, ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ—ব্রহ্মপুত্র নদ এই তিনটি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। ব্রহ্মপুত্রকে বাগে আনতে হলে তার আগে এই তিনটি দেশের হাত মেলানো প্রয়োজন। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে জন্মলগ্ন থেকেই এই তিনটি দেশের মধ্যে বিরোধ বিসম্বাদ লেগেই আছে। অদূর ভবিষ্যতে এইসব ঝুল ঝেড়ে ফেলা হবে—এমন আশা করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই, কাজটি বৃহৎ এবং সময়সাপেক্ষ—অতএব কোন ভোজসভায় কে কার দিকে তাকিয়ে কখন একটু হাসলেন তার উপর ভরসা করে এ-কাজে হাত দেওয়া চলবে না।

এত সবের পরে আর টাকার চিন্তায় রাত-জাগবার কোন মানে হয় না। তাছাড়া এ-কাজে যে বিশাল-বিপুল মূলধনের প্রয়োজন ভারত একার চেষ্টায় তা কোনদিনই সংগ্রহ করতে পারবে না। এজন্য আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকতার আবশ্যক। পর্যাপ্ত নাফার সুনিশ্চিত সম্ভাবনা না থাকলে বিশ্বের বিত্তবান পৃষ্ঠপোষকেরা আজকাল নির্দ্বিধায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে থাকেন। তাছাড়া ভিক্ষার টাকায় কোনদিন কোন জনহিতকর কাজ সফল হয়নি; মুষ্টিভিক্ষার উপর ভরসা করে একাজে হাত দেওয়া মূঢ়তা হবে।

অনেকদিন আগে আসামের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহ বলেছিলেন: আসাম উপত্যকায় ব্রহ্মপুত্রের বন্যাকে জীবনের একটা অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা উচিত। শ্রী সিংহের এই যথার্থ কথায় পরাজিত মনোভাবের গন্ধ আবিষ্কার করে অপরাপর রাজনৈতিক নেতারা তখন একেবারে মাৎ-মাৎ করে উঠেছিলেন: প্রশাসনের অপদার্থতা ঢাকবার জন্য ব্রহ্মপুত্রের রঙ চড়ানো হচ্ছে! যোগ্যতর লোকের হাতে প্রশাসন থাকলে এই মুহূর্তেই- ইত্যাদি। তবে রাজনৈতিক নেতাদের চেঁচামেচিতে সত্য কথাটা চিরতরে মিথ্যা হয়ে

যায় না। একথা ঠিক যে, আসাম উপত্যকায় ব্রহ্মপুত্রের বন্যাকে জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য করতে হবে—তারপরে অন্য কথা।

ভারতবর্ষ প্রতি বছর যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আসে আসাম উপত্যকার চা ও পাট বিক্রি করে। বন্যার্তদের ক্ষোভ যতদিন ভগবানের বিরুদ্ধে ছিল ততদিন গ্রাম-গঞ্জের নামঘরগুলোই তা সামলে দিত। কিন্তু গত ত্রিশ বছরে ব্রহ্মপুত্রের বন্যাকে কেন্দ্র করে যেসব কায়েমী স্বার্থ গড়ে উঠেছে সেগুলোর বিরুদ্ধেও ক্ষোভ ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। কেবল সাম্প্রদায়িক উসকানি এবং বঙ্গাল-খেদা আন্দোলন করে এই ক্ষোভ বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। এই ক্ষোভ অতঃপর একদিন রাজনৈতিক চেহারা নিয়ে ফেটে পড়বেই। আসামের চা ও পাট শিল্পের উপর তখন সংকট ঘনীভূত হবে, বৈদেশিক মুদ্রার উপর তার ছায়া পড়বে। তাই বলছিলাম : ব্রহ্মপুত্রের বন্যা-সমস্যাটা আসলে একটা জাতীয় সমস্যা এবং একমাত্র জাতীয় স্তরেই এর মোকাবিলা সম্ভব।

সমস্যাটিকে জাতীয় সমস্যা বলে স্বীকার করে নিলেই সেটির সমাধান হয়ে যাবে না। এই বন্যা আছে এবং থাকবে। সমস্যাটি হল : এই বন্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, এর প্রমত্ততা যথাসম্ভব খর্ব করা এবং বন্যাক্লিষ্টদের দুর্গতি যতটা কমানো যায় তার চেষ্টা করা। এসব কাজ খুব সহজ নয়। সম্বলহীন রাজ্য সরকারের উপর পুরো দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে গত ত্রিশ বছরে কাজ কিছুই হয়নি, বরং অনেক ঘোঁট পাকানো হয়েছে। এইসব কাজের জন্য প্রয়োজন একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা।

এই কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রথম কাজ হবে ত্রাণকার্য দুর্নীতি মুক্ত করা। কঠিন কাজ। হাজার রকমের কায়েমী স্বার্থ গজিয়ে গেছে। কিন্তু কেবল একটা কেন্দ্রীয় সংস্থাই এসব জঞ্জাল সাফ করবার

কাজে হাত দিতে পারে। প্রথমেই বন্যাত্রাণ ব্যাপারটিকে রাজনীতির কলুষমুক্ত করতে হবে। আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রে এইটে বড় সহজ কাজ নয়, কিন্তু এটি করতে না পারলে আসল কাজে হাতই দেওয়া যাবে না। 'ব্যাওসায়ী' মহলকেও এই ত্রাণকার্য থেকে তফাৎ রাখতে হবে এবং হাজার রকমের অন্যান্য ভাগ্যান্বেষীদেরও।

এইভাবে গোয়াল সাফ হয়ে গেলে তারপর প্রথম কাজ হবে বন্যার্তদের ক্লেশ প্রশমিত করা। একাজের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের প্রয়োজন। বন্যার জল কোথায় কতটা কিভাবে ক্ষতিসাধন করছে বা করতে পারে, সেখানে কখন কি ধরনের সাহায্য প্রয়োজন, কত দ্রুত এবং কতটা সুশৃংখলার সঙ্গে অকুস্থলে সাহায্য পাঠানো যায়, বন্যাক্লিষ্টদের মেজাজ বুঝে কথা বলা এইসব এবং আরও অজস্র রকমের কাজের জন্য হুট্‌ বললেই লোক পাওয়া যায় না। শহরে আগুন লাগলে সেজন্য ফায়ার ব্রিগেড থাকে, ট্রেনিং দেওয়া লোক থাকে। ব্রহ্মপুত্রে বন্যা শহরে আগুনের চাইতেও অনিশ্চিত। এ-জন্যও অবিলম্বে স্পেশাল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা থাকা দবকার। এরা আগেভাগে প্রলয়ের সম্ভাব্য পরিমাপ কষে রাখবে, সব কিছু গুছিয়ে রাখবে এবং প্রলয় শুরু হলেই সুশৃঙ্খলভাবে কাজে নেমে পড়বে। তাহলে আর ত্রাণ-কার্যের জায়গায় উদ্ধার সামগ্রী এবং উদ্ধারকার্যের জায়গায় ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকবার সুযোগ থাকবে না। কেবল ত্রাণের কাজ করেই এসব ত্রাণকর্মীর দায় ফুরোবে না। গ্রামে গ্রামে গিয়ে পুনর্বাসনেব কাজ এদেরই করতে হবে। যুগপৎ এই দু'টি দায়িত্ব এদের হাতে দিতে পারলে, ত্রাণকর্মীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবার সম্ভাবনা।

গত ত্রিশ বছরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অনেক বাঁধ তৈরি হয়েছে, ব্রহ্মপুত্রকে পিঞ্জরাবদ্ধ করবার চেষ্টায় অনেক বড় বড় ব্যয়সাপেক্ষ বাঁধ। কোন কোন জায়গায় বানের প্রথম পর্যায়েই এইসব বাঁধ

ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেছে ; অধিকাংশ জায়গায় এইসব বাঁধ বৃহত্তর ক্ষতির কারণ হয়েছে। বানের জল এদের ভেদ করে অতি সহজেই খেত-খামার ভাসিয়েছে, কিন্তু বান নেমে যাবার পরে আর বানের জল এদের ভেদ করে নদীতে ফিরে যেতে পারেনি। একদিকে অভিজ্ঞতার অভাব এবং অপরদিকে সস্তায় বাজিমাৎ করবার ধান্দা —এই দুইয়ে মিলে এমন বিপত্তি।

দুই নম্বর লাভ : ভবিষ্যতে যদি কোনদিন ব্রহ্মপুত্রকে বশে আনবার উদ্যোগ সত্যই শুরু হয় তবে তখন এই ত্রাণকর্মীদের অর্জিত অভিজ্ঞতা অমূল্য বলে বিবেচিত হবে। ব্রহ্মপুত্রের সান্নিধ্যে এবং বন্যাক্লিষ্টদের সাহচর্যে দীর্ঘদিন বসবাস না করলে এই অভিজ্ঞতা হতে পাবে না।

এমন একটা কেন্দ্রীয় সংস্থা স্থাপন করা সম্ভব কিনা ; সেই সংস্থাকে কতদিন রাজনীতি ও দুর্নীতির কলুষমুক্ত রাখা সম্ভব ; কায়েমী-স্বার্থগুলি কোন কোন দিক থেকে এই সংস্থার উদ্দেশ্য বানচাল করে দিতে পারে—এইসব প্রশ্নও বিচার করে দেখবার আবশ্যকতা আছে। যথাসময়ে তা করতেও হবে। কিন্তু এই ঘোর বর্ষায় শিরে-সংক্রান্তি নিয়ে এইসব প্রশ্ন তোলবার কোন প্রয়োজন নেই। এই মুহূর্তে যা প্রয়োজন তা হল সমস্যাটিকে একটি জাতীয় সমস্যা বলে মেনে নেওয়া এবং এজন্য একটা কেন্দ্রীয় সংস্থা স্থাপন করা।

ব্রহ্মপুত্রের ছোট বড় অনেক বন্যা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। ডিব্রুগড়ের নদীতটে দাঁড়িয়ে দেখেছি কেমন করে দেড়-দুই বর্গমাইলের সুশ্যামল ধানক্ষেত ঝপ করে জলের আবর্তে মিলিয়ে যায়। দারাঙ জেলায় দেখেছি গ্রামের পর গ্রাম কেমন করে খেলনার মতো ভেসে যায়। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আশ্রয়শিবির ঘুরে ঘুরে দেখেছি বন্যার্তদের সঙ্গে কেমন কুকুর-বেড়ালের মতো ব্যবহার করা হয়। ওদের চাহিদার অন্ত নেই, ওরা অবুঝ, সবই ঠিক। কিন্তু তবুও এমন ধারাই কি চলতে দেওয়া হবে ?—এসবের কি কোন বিহিত হবে না ?

এদেশে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের গায়েও ঝুল জমে। আমার প্রশ্ন কয়টির গায়েও—আজকের কথা ত নয়—ঝুল জমতে শুরু করেছিল। অচিরেই আবার সবাই সবকিছু ভুলে থাকতাম। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ আবার আইজ়ল থেকে বন্দুকের আওয়াজ এল, আশা করি দিল্লি পর্যন্তও তা পৌঁছেছে। হাজার হাজারের সঙ্গে অতিরিক্ত তিনটে মৃত্যু এমনিতে খুব বড় কিছু নয়। কিন্তু যেহেতু তাঁরা উচ্চকোটির মানুষ অতএব তাঁদের দিয়ে খুব একটা হৈ চৈ অবশ্য থেমে যাবে, যেমন যায়, যেমন এর মধ্যেই গেছে। কিন্তু এই দমকা হাওয়ায় আমার সেই প্রশ্নগুলোর গা থেকে সব ঝুলগুলো আরেকবার খসে গেল। সেদিন ছিল নাগাল্যাণ্ডের দশম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস। দালানে দালানে চুনের কলি লাগিয়ে, বড় বড় রাস্তার ধারে ধারে মোটা বাঁশের মজবুত রেলিং তুলে, পথের মোড়ে মোড়ে তোরণ সাজিয়ে সেই উপলক্ষে কোহিমার বেশ মনভোলানো সাজ। দূর দিল্লি থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এসেছিলেন উৎসবে যোগ দিতে আর শিলং থেকে এসেছিলেন পূর্বাঞ্চলের রাজ্যপাল লালন প্রসাদ সিং। লালন প্রসাদের সঙ্গে একই হেলিকপটারে চেপে, তারই অতিথি হিসাবে আমরা কতিপয় সাংবাদিকও। উৎসবের প্রস্তুতি পবে কোহিমায় লালন প্রসাদের কিছু কাজ ছিল, আমরা তাই প্রধানমন্ত্রীর দুদিন আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম। কোহিমাকে আমরা ধাপে ধাপে সেজে উঠতে দেখেছি। অভিজ্ঞতাটি, খুব কম করে বললেও, আদৌ সুখকর ছিল না।

আমাদের দেশের জনপ্রিয় মন্ত্রী মহোদয়েরা কোথাও গেলে তাঁদের জন্য যে নিরাপত্তার ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হয় তা সকলেই জানে। এসব আর আজকাল আমরা খেয়ালই করি না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর

শুভাগমন উপলক্ষে কোহিমায় যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার কঠোরতায় এমনকি আমরাও হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। নাগাল্যাণ্ডের রাজধানী কোহিমার নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্বাভাবিক সময়েই খুব সুদৃঢ়। রাস্তা দিয়ে পাঁচটা লোক হেঁটে গেলে তার মধ্যে তিন জনই নিরাপত্তা বাহিনীর কোন-না-কোন বিভাগের কর্মচারী। সূর্যাস্তের পর এখানে মাতালেরা ছাড়া কেউ রাস্তায় বেরোতে সাহসই পায় না। অবাধগতি সাংবাদিকদেরও এখানে মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে যেতে হলে অন্তত চার জায়গায় চার দফা নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। বাইরে থেকে সে যেদিক থেকেই হোক, কোহিমায় কেউ এলে তাঁর পিছনে তৎক্ষণাৎ একাধিক ফেউ লেগে যায়—লেগে থাকে সর্বক্ষণ।

'কোহিমার অবশ্যই এমন সজাগ থাকবার সম্পূর্ণ বৈধ প্রয়োজন (টোটালি লেজিটিমেট নেসেসিটি) আছে! নইলে কোহিমা কবে হারিয়ে যেত!' খোদ কোহিমায় বসেই একদিন রাতের বেলায় আনডার গ্রাউনডের চিটু হুররে আমায় একথা বলেছিল। চিটু হুররে দিনের বেলায় ভিন্ন নামে ভারত সরকারের একজন পদস্থ কর্মচারী।

নাগাল্যানডের দশম বর্ষপূর্তির তিন দিন আগে থাকতে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী নিজেদের উপরই টেক্কা মেরে বসে রইল। কোন গুলিগোলা নেই, রক্তপাত নেই, কিন্তু কোহিমা যেন হঠাৎ এক সত্যকারের রণাঙ্গন। তিন দিন আগে থাকতেই পথ থেকে হটিয়ে পথচারীদের রেলিঙের ওদিকে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে, ঠেলাঠেলি করে যেতে আসতে বাধ্য করা হয়েছে। রাস্তার উপরে কয়েক হাত পর পরই এল-এম-জি হাতে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা প্রস্তুত। মাঝে মাঝে পাহাড় কাঁপিয়ে এক একটা সাঁজোয়া গাড়ি যাচ্ছে। বন্দুক যদি বন্ধুর হাতেও থাকে তবুও গা-টা রি রি করে। কোহিমায় সেবার পৌঁছনো থেকেই আমার গা-টা রি রি করছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার উঁচু মঞ্চ থেকে রাইফেলের রেনজের বাইরে রংবেরঙের যে

পাহাড়ী জনতা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছিল, এবং আপনার বক্তৃতার সময় মুহুর্মুহু হাততালি দিচ্ছিল, তাদের সবাই বলা বাহুল্য অতি যত্নসহকারে ঝাড়াই-বাছাই করা। তবুও তাদের অনেক আগে থাকতেই এনে বসিয়ে রাখা হয়েছিল, বারবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল এবং তাদের উপর অনুক্ষণ নজর রাখা হচ্ছিল -- যদিও এদের শতকরা সত্তর জনই জীবিকার জন্য নাকি আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রয়োজনীয় বদান্যতার উপর নির্ভরশীল। এমনকি নিরাপত্তা বাহিনীরও অনেককেই অনেকবার জবাবদিহি করতে হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীরই লোকের কাছে!- তা দেখে এই অধম কতকটা সান্ত্বনা পেয়েছে। কেন না, তার একটু মাত্র আগে এক ঝাঁক সাংবাদিকের সঙ্গে নানা জায়গায় নানা জনের কাছে নানা রকম জবাবদিহি করতে করতে এবং নানা রঙের কারড দেখাতে দেখাতে এই অধম সবে মেলা গ্রাউনডের প্রেস এনক্লোজারে এসে পৌঁছেছে। সাংবাদিক হিসেবে এমন অপমানকর আচরণের সঙ্গে আমরা ঠিক অভ্যস্ত নই। প্রেস এনক্লোজারে আমরা সবাই নিশ্চয়ই তখন ভাবছিলাম যে এর একটা জোরালো প্রতিবাদ করতে হবে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে দেখলাম একজন স্থানীয় সিক্যুরিটি অফিসার আইডেনটিটি কারড বের করে আরেকজন সিক্যুরিটি অফিসারের কাছে সন্ত্রস্ত হয়ে নিজের পরিচয় দিচ্ছে। ব্যাপারটা দেখে একটু হেসেছিলাম। তটস্থ সিক্যুরিটি অফিসারদের মাঝখান দিয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে উঠলেন, জনতাকে অভিবাদন জানালেন, তারপরে ভাষণ দিলেন। ভাষণে খুব নতুন কিছু ছিল না। গত দশ বছরে নাগাল্যানডের কত উন্নতি হয়েছে সে কথা আর মুখ্যমন্ত্রী হোকিসে সেমার কিছু প্রশস্তি। প্রশস্তিটুকুর মানে কাউকে বলে দেবার প্রয়োজন ছিল না—কারণ তার চার মাস পরেই নাগাল্যানডে সাধারণ নির্বাচন। পরে হোকিসে সেমা দু'চার কথা বললেন, তারপরেই মোটরকেড আবার রাজভবনের দিকে চলে গেল। মেলা গ্রাউনডে

তার পরেও কিছুক্ষণ নাগাদের ট্রাইবাল নাচ গান হল—কিন্তু সেই সব রাইচ্যুয়ালে আমাদের কৌতূহল আপনার চাইতেও কম।

সারাদিনের বিরক্তিকর হুজ্জতির পর আটটা টেক-য়ে খবর পাঠিয়ে আমি, আমরা সবাই, সেদিন যাকে বলে সত্যিকারের রণক্লান্ত। সন্ধ্যার পরে হাত মুখ ধুয়ে সবাই সতীর্থ সুবিনয় ভট্টাচার্যের ডেরায় হাজির হয়েছি। পি-এম যদি আটটার মধ্যে প্রেস কনফারেন্স করেন তো ভালো, নয়তো ঠিক আটটার সময়ই আমরা হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিতে শুরু করে দেব। সরকারের বিভিন্ন তরফের অফিসাররা আগে থাকতেই নানা রকমের কষ্টহরার ঢালাও ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

গত পঁচিশ বছরে কপটতা জিনিষটা আমরা আমাদের জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছি। রাজনৈতিক নেতার মিথ্যা-ভাষণে বা ব্যবসায়ীর মিথ্যা আচরণে আজকাল আর আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত বা বিচলিত হই না; একটু এদিক সেদিক না করলে কোন কাজ হয়! আমাদের সাংবাদিকদের কথাই ধরুন, সেদিন কেউই আমাদের কোনরকম নির্দেশ দেয়নি, তবুও আমরা কত খেটে-খুটে যে রিপোরট পাঠিয়েছিলাম তাতে প্রধানমন্ত্রী, আপনার বক্তৃতা ছিল, বর্ণাঢ্য উপজাতি জনতার সহজাত শৃংখলাবোধের কথা ছিল। কিন্তু তাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা ছিল না, আর ছিল না নাগা জাতীয়তাবোধের অতিস্পষ্ট অবমাননার কথা। অথচ আমরা কারো নির্দেশে এমন একপেশে রিপোরট লিখিনি, কোনরকম চিন্তা ভাবনা না করেই আমরা প্রকৃত ঘটনার অনেক কিছু স্বচ্ছন্দে বাদ দিয়ে গেছি। গত পঁচিশ বছরে কপটতা এখন আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, কপটতা আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসে। উপজাতিরা, বিশেষ করে পাহাড়ী উপজাতিরা, অসভ্য বলেই হয়তো, একটা জিনিস অকপটে ঘৃণা করে—সেটি হল এই কপটতা। অথচ এই কপটতা দিয়েই গোড়া থেকে আমরা নাগাদের মন জয় করবার চেষ্টা করে আসছি! এখনো ওদের বশে আনবার চেষ্টা করছি!

ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়, ১৯৪৭ সনে, নাগারা স্বাধীন হতে চাইল। ওদের দিক থেকে বলা চলে—স্বাধীন থাকতে চাইল। ব্রিটিশরা ওদের যুদ্ধে পরাস্ত করেছিল অতএব ব্রিটিশদের বশ্যতা ওরা মেনে নিয়েছিল। ব্রিটিশরা চলে গেলে আবার স্বভাবতই স্বাধীন হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ভারতীয়দের কোন ভূমিকাই ছিল না। ব্রিটিশদের তকমা নিয়ে তাই পরবর্তীকালে আমরা যখন গিয়ে নাগা পাহাড়ে হাজির হলাম—নাগারা তখন আমাদের ময়ূরপুচ্ছ দেখে ভোলেনি। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আর অর্জন করা ক্ষমতায় যে কোন পার্থক্য আছে ব্রিটিশদের উত্তরাধিকারী হিসাবে সেকথা আমরা মনে রাখি নি। তকমার জোর না খাটিয়ে আমরা যদি তখন পরিবর্তিত অবস্থাটার কথা ঠাণ্ডা মাথায় নাগাদের বোঝাবার চেষ্টা করতাম তবে আর আজ আমাদের নাগা সমস্যার ক্যানসার নিয়ে এমন ভুগতে হত না। আমাদের রাজা-মরে-গেলেও-রাজা-চিরায়ু-আছেন ভাবটা দেখে নাগারা কিন্তু একটুও মোহিত হয় নি। ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের সম্পর্কে তখন থেকেই ওদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। ওদের কাছে কপটতার কোন ক্ষমা নেই।

আমাদের প্রথম চাতুরীটা ব্যর্থ হতে আমরা তারপর দ্বিতীয় একটি চাল ছাড়লাম। আমাদের সংবিধানে নাগা উপজাতিদের একটা বিশেষ স্থান দেওয়া হল এবং দশ বছর বাদে আবার ভারতবর্ষের সঙ্গে নাগা পাহাড়ের সম্পর্কটা আগাপাশতলা পর্যালোচনা করে দেখা হবে এই শর্তে ওরা দশ বছরের জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে রাজি হল। তখন আমরাও কাশ্মীর নিয়ে ব্যতিব্যস্ত আর ওরাও সম্পূর্ণ অসংগঠিত—উভয়পক্ষেরই তখন এই দশটি বছর খুব প্রয়োজন। এই দশটা বছরে ওরা একদিকে ওদের নাগা জাতীয়তাবোধ পরিপুষ্ট করল, আমরা আরেকদিকে আমাদের ব্যুরোক্রাটদের মারফত ওদের সঙ্গে সংহতি জমাবার চেষ্টা করলাম। ব্রিটিশদের সঙ্গে ওঁরা এক সময়ে গোটা ভারতবর্ষকে অবনত রেখেছেন, কিন্তু তবুও পুরো দশ

বছরে ওঁরা ক্ষুদ্র নাগা পাহাড়কে তাঁবে আনতে পারলেন না। উপায়ান্তর না দেখে তখন আমরা দ্বিতীয়বার কপটতার আশ্রয় নিলাম। সম্পর্কের পর্যালোচনা শিকেয় তুলে রেখে আমরা ওদের হাতে গণতন্ত্র গছিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম - ভারতের আগমার্কা গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্র নাগারা সেদিন, বা কোনদিন, অন্তর থেকে গ্রহণ করেনি।

ষাটের দশকের সেই একেবারে গোড়ার দিকেই নাগাদের সঙ্গে আমাদের চির বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। তার পর থেকে আমরা যত ওদের কাছে টানতে চেষ্টা করেছি ততই ওদের দূরে সরিয়ে দিয়েছি এমনটাই অবশ্যম্ভাবী। আমরা এখনও সেই ব্রিটিশদের চোখ দিয়েই সব কিছু দেখি, --বুঝবার চেষ্টা করি যদিও সেই অন্তর্দৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি আমাদের কোনকালেই ছিল না। তাছাড়া ব্রিটিশদের সেই কালটাও অনেকদিন কেটে গেছে। তবুও আমরা আমাদের পরে পাওয়া ব্রিটিশ মুখোশটি ছাড়বো না! অন্য সবাই আমাদের চেহারা দেখে হাসে, মূঢ়তার সুযোগ নেয় --নাগারা আমাদের ঘৃণা করে।

সারাদিনের বিরক্তিকর হুজ্জতির পর আট-আটটা টেক পাঠিয়ে সেদিন, আমরা সবাই তখন ক্লান্তিতে উন্মুখ হয়ে আছি, অফিসাররা আগে থাকতেই সবকিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন - সেগুলো আমাদের দারুণভাবে প্রলোভিত করছিল। কোহিমায় এলেই, এর আগেও প্রত্যেকবারই দেখেছি একটু সুযোগ পেলেই ওই জিনিষটা দারুণভাবে প্রলোভিত করে। কেবল প্রলোভিতই করে না, সর্বদা সর্বত্র ধাওয়া করে বেড়ায়। ড্রিংকস মানে মদ জিনিষটা অবশ্য এখন সামরিক বেসামরিক সব মহলেই সর্বত্র খুব জনপ্রিয়; সন্ধ্যের পর কোথায়ও ড্রিংকস-য়ের ব্যবস্থা না থাকলে সন্ধ্যেটাই মাটি হয়ে যায়। এই ব্যাপারে আমরা সাংবাদিকেরা আবার একটু বেশি স্পর্শকাতর, আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমাদের যাঁরা নিমন্ত্রন করেন তাঁরা সে কথাটা ভালোভাবেই জানেন।

রাজভবন থেকে টেলিফোনের আশায় বসে থাকতে থাকতে সেদিন মাথায় একটা প্রশ্ন খেলে গেল। সব উপচার সাজিয়ে অমন অসহায়ের মতো বসে থাকতে না হলে এমন উটকো প্রশ্ন কখনোই মাথায় আসত না।

কোহিমায় সবাই সব সময় এত মদ খায় কেন? বসে থাকতে থাকতে আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে, বাধ্য হয়েই খায়। ভিয়েতনামেও আমেরিকানরা সব সময় এমনি ধারা বুঁদ হয়ে থাকত। যুদ্ধ অচলাবস্থায় পৌঁছে গেছে; প্রতিপক্ষকে একটা গাঁয়ে শায়েস্তা করলে সে আবার দশটি গাঁয়ে মাটি ফুঁড়ে বেরোয়; গণতন্ত্র, জাতীয় সংহতি ইত্যাদি স্লোগানগুলো বহু ব্যবহারে এখন নামতার মতো শোনায়; এই যুদ্ধে জয়ের আশা নেই, চালিয়ে গেলে অনন্তকাল ধরে চলবে। সুযোগ ছিল তাই ব্রিটিশরা সময় মতো পালিয়ে যেতে পেরেছিল, আরও কিছুদিন নাস্তানাবুদ হবার পর আমেরিকাও একদিন অবশ্যই ভিয়েতনাম ছেড়ে যাবে; কিন্তু নাগাল্যাণ্ড ছেড়ে ভারতীয়রা পালাবে কোথায়? ব্রিটিশদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নাগাল্যাণ্ডের ব্যূহে ঢুকে পড়া গেছে, কিন্তু ব্রিটিশদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবার উপায় নেই--এমন গাড্ডায় পড়লে মুনি-ঋষিরাও মদ খেতেন। হেরে গেলে কেউ কেউ হারাকিরি করে, কেউ কেউ উন্মাদ হয়, আমরা মাতাল হই—এবং হারতে থাকি।

এরপর রাত আটটা বেজে যেতে রাজভবন থেকে খবর এল যে প্রধানমন্ত্রী খুবই ব্যস্ত অথবা ক্লান্ত, তাই আজ আর কোন প্রেস কনফারেন্স সম্ভব নয়। এতক্ষণ আশা করে বসে থাকবার পর এই সংবাদে আমরা নিদারুণ হতাশ হইনি। আমাদের অভিজ্ঞতা তো নেহাত কম নয়—তাছাড়া নতুন কী-ই বা আপনি বলতেন?—আপনার সব বক্তব্য আমরা লিখে দিতে পারতাম। কিন্তু ততক্ষণে আমাদের সকলেরই পেটে দু-এক পাত্র পড়ে গেছে, আমরা সবাই যে যার লাইনে চলতে শুরু করে দিয়েছি। যে যার লাইন

ধরে এগোলেও নাগা সমস্যা নিয়ে আমাদের লাইনগুলো মোটামুটি একটাই লাইন ধরে চলে। নাগাদের উপর চারচের প্রভাব বাড়ছে না কমছে। অন্তর্বিরোধে আনডারগ্রাউণ্ড কতটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, আর কতদিন লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে? আনডারগ্রাউণ্ড কি সত্যিই কোন বোঝাপড়ায় আসতে চায়? নাগাল্যাণ্ডে এখন ফিজোর প্রভাব কতটা? সি. আই. এ. কেন নাগাল্যাণ্ডে এত টাকা ঢালছে, ওরা কি চায়? আনডারগ্রাউনডের সঙ্গে চীনাদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা কতটুকু? তার চরিত্রটাই বা কি? উত্তর ব্রহ্মের রাজনৈতিক ও প্রশাসানিক অরাজকতা এবং দুর্গম অরণ্যপর্বত অতিক্রম করে যুদ্ধে জেতবার মতো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসা সম্ভব নয়, কিন্তু অনন্তকাল ধরে যুদ্ধটা চালিয়ে যাবার মতো মতাদর্শ নিয়ে আসা সম্ভব। ধর্মভীরু ক্রিশ্চিয়ান নাগারা কি এরপর নাস্তিক কম্যুনিষ্ট হয়ে যাবে? কারো কারো আবার তত্ত্বের চাইতে তথ্যের দিকে ঝোঁক বেশি। ব্রিটিশ আমলের চাইতে নাগাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কি এখন অনেক বেশি উন্নত নয়? ভারতের বাইরে চলে যাওয়া মানে তো আবার সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন অস্তিত্বে ফিরে যাওয়া। মিশনারিদের প্ররোচনা না থাকলে এই বিদ্রোহ করে থেমে যেত। নাগা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য কোহিমায় এবং শিলঙে এমনকি দিল্লীতে কত অজস্র বৈঠক বসেছে, কত কমিশন নিয়োগ করা হয়েছে। সেই সব বৈঠকের সন তারিখ, সেইসব কমিশনের রিপোরট সকলেরই জানা। এইসব নিয়ে সংবাদপত্রের হেডলাইন হয়, কেউ কেউ নাগা-সমস্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হয়ে খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু নাগা-সমস্যার কিছুমাত্র সুরাহা হয় না এখনও হয় নি, হচ্ছে না।

ওই সব ঐতিহাসিক আবর্জনা দিয়ে ভর্তি করবার জন্য এটা লিখতে বসিনি, গোলকধাঁধায় নাগা-সমস্যার সমাধান নেই; কেবল সমস্যাটিতে আরও জট পাকাবার ব্যবস্থা আছে, কোহিমায় সেদিনের সেই সান্ধ্য আড্ডায় সমবেত সবাই যখন ওই সব তত্ত্ব ও

তথ্য নিয়ে খুব দ্রুত নাগা-সমস্যাটির সমাধানে ব্যস্ত তখন আমার ঈষৎ রক্তিম চোখের সামনে একের পর এক ছবি ভেসে উঠছিল—নাগাল্যানডের, মিজোরামের, অরুণাচলের—সেই সব ছবির একটা অ্যালবাম প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে উপহার দিতে চাই।

প্রথম ছবি: গ্রামের নাম খুনুমা, নাগাল্যানডের আংগামি এলাকায় অন্য দশটা গ্রামের মতো একটা গ্রাম। পাহাড়ের একেবারে চূড়ার কাছাকাছি কয়েকটা ধাপে কয়েকটি বিরাট বিরাট নৌকা যেন উপুড় করে রাখা আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাছাকাছি সময় থেকে নাগারা এমনিধারা বাসা বানায়, পাহাড়ের চূড়োয় গ্রাম গড়ে তোলে। কোহিমা থেকে মাইল তিরিশেক পথ পাহাড়ে পাহাড়ে চক্কর খেয়ে খুনুমা গ্রাম।

১৯৭৩ সনের ২৯ নভেম্বর, বেলা চারটে নাগাদ আমরা যখন খুনুমা গিয়ে পৌঁছলাম গাঁয়ের মরদরা তখনো ক্ষেতের কাজ সেরে ফিরে আসেনি। মেয়েরা ঘরের কাজে বিনা ব্যস্ততায় ন্যস্ত, একেবারেই বুড়োরা উঠোনের পড়ন্ত রোদে বসে বাঁশের ধামা কুলো বুনছে, ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে খেলা করছে। কোথায়ও এতটুকু কোলাহল নেই, বাচ্চাগুলো কেবল মাঝে মাঝে খুশীতে ফেটে পড়ছে জলতরঙ্গের মতো। এমন শান্ত স্নিগ্ধ গ্রাম কবিতার বাইরে এর আগে আমি কখনো দেখিনি।

'উনিশ শ ষাট থেকে তিয়াত্তর এই বারো বছরে ছয়বার এই গ্রামটিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে—গড়ে প্রতি দু বছরে একবার।' একটু আগেও লোকটার নাম ছিল পিয়ালু আংগামি, এখন চিটু হুররে। একটা ওলটানো নৌকোর ভেতরে ঢুকে প্রায়ান্ধকার বসবার ঘরটির মেঝেয় একটা কম্বল বিছিয়ে দিয়ে হুররে সকলের বসবার ব্যবস্থা করল। 'কি দিয়ে শুরু করবেন—চা না মধু?'

'মধুই হোক!' মধু মানে নাগাদের রাইস বিয়ার। সাদাটে

মতো, একটু টক টক স্বাদ, খুব আস্তে আস্তে নেশা হয়। 'বারো বছরে ছয়বার !'

'হ্যাঁ, ছয় বার, প্রথম চার বার একটা করে পোড়া বাসা রেখে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমাদের গ্রামে জায়গার এত অভাব— তাছাড়া প্রতিবারই একটা করে পোড়া বাসা ছেড়ে দিলে আর অল্প দিনের মধ্যে গাঁয়ে আর একটাও বাসযোগ্য বাসা থাকবে না— তাছাড়া তোমাদের সেনা বাহিনীও আগে হোক পরে হোক ব্যাপারটা নির্ঘাত ধরে ফেলত তাই -।'

বাইরে থেকে দেখলে গ্রামটির গায়ে নির্যাতনের কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না, কিন্তু প্রত্যেকটা বাসারই অন্তত কয়েকটা কাঠের থামে আগের ওই সব অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষ্য রয়ে গেছে। ছয় ছয়টি অগ্নি-পরীক্ষার পর খুনুমা বেশ কিছুটা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। কিন্তু সেইটে কেবল লোকমুখে, খুনুমা এমনিতে নাগাল্যানডের অন্য দশটি গ্রামেরই মতো। দারিদ্র্য নেই, প্রাচুর্যও উপছে পড়ছে না ; ভিখারী নেই, জমিদারবাবুও অনুপস্থিত। নুন, কেরোসিন এবং ঐ ধরণের দুটো চারটে আইটেম ছাড়া খুনুমা মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম—অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা সত্ত্বেও এখনও দিব্যি নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাওসায়ীদের প্রভাব পুরোপুরি এড়াতে না পারলেও অন্তত কাবুলি-ওয়ালাদের এখনও ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয় নি। কারো কারো গোলায় হয়তো একটু বেশি ধান ওঠে, কিন্তু কারো গোলাই শূন্য পড়ে থাকে না।

হয়তো খুব সম্প্রতি কম্যুনিজম শব্দটা খুনুমার কানে এসে থাকবে। কিন্তু মোটামুটি একটা অর্থনৈতিক সমতা খুনুমায় এবং নাগাল্যানডের অন্য সব গ্রামেই চিরদিন ছিল এবং এখনও আছে। বছর কয়েক আগে পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর খুনুমায় একটা কেন্দ্র খুলে বসেছিল ; কিন্তু সাইনবোরড লাগিয়ে মাস ছয়েক বসে থাকবার পরেও কেউ পরামর্শ নিতে না আসায় নিজে থেকেই পাততাড়ি

গুটিয়ে চলে গেছে। পাশের গাঁয়ে মিশনারিদের একটা হাসপাতাল আছে, সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আউটডোরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না।

কিন্তু খুনুমা, নাগাল্যানডের অন্য শতকরা নব্বুইটি গ্রামের মতোই অনেকটা তরমুজের মতো। বাইরে থেকে দেখলে সবুজ স্নিগ্ধ, কিন্তু ভেতরটা লালে লাল। সশস্ত্র বিদ্রোহের রক্তে লাল। খুনুমা কিন্তু স্বেচ্ছায় এ পথ বেছে নেয়নি।

বছর বারো আগে খুনুমা থেকে মাইল পাঁচেক দক্ষিণে একটা অ্যামবুশ হয়। দুজন ভারতীয় জওয়ান মারা যায়, একজন আহত হয় এবং পেট্রল পাবটির অন্য সবাই পালিয়ে আসে। খুনুমা তখনও কেবল দূর থেকে বিদ্রোহের কথা শুনেছে, ছ্যাকা খায়নি, ওই অ্যামবুশে খুনুমার কোন ছেলে ছিল না। কিন্তু তবু দুদিন পরেই সেনা বাহিনীর লোকেরা বন্দুক উঁচিয়ে ফাঁকা আওয়াজ করতে করতে খুনুমায় হাজির। প্রথমেই ওরা গ্রামবাসীদের – আবালবৃদ্ধ বনিতা একটা খোলা জায়গায় জড়ো হতে বলে, তারপর একটি একটি করে গ্রামের প্রত্যেকটি বাসা খানাতল্লাসী করা হয়। খানা-তল্লাসী মানে সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দেওয়া। তারই মধ্যে এক সময় একজন একজন করে গ্রামবাসীদের জেরা শুরু হয়। জেরা মানে কিল, চড়, বেয়নেটের খোঁচা, বাঁশের সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা ইত্যাদি। এই জেরা শেষ হতে হতে বেলা গড়িয়ে যায়। যাবার আগে সেনাবাহিনীর লোকেরা পাঁচটি মেয়ে সমেত তেইশ জনকে গ্রেফতার করে এবং গ্রামের কোণের তিনটি বাসায় আগুন লাগিয়ে দেয়। মেয়ে পাঁচটি সেদিন রাত্রিতেই, বিভিন্ন সময়ে, কোনক্রমে আবার গ্রামে ফিরে আসে। সেদিন রাত পোহাবার আগেই খুনুমার জন্মান্তর ঘটে গেছে। তার পরে আরও পাঁচটি অগ্নি-পরীক্ষা সসম্মানে অতিক্রম করে খুনুমা এখন আর কিছুতে ভয় পায় না। আনডারগ্রাউনড ফেডারেল সরকারকে ট্যাক্স দেয়, গ্রামের

আটাশটি ছেলে এখন নানা জায়গায় ট্রেনিং নিচ্ছে, খুন্নুমা এখন· পুরোপুরি শত্রুপক্ষের দলে। খুন্নুমার গল্প হতে হতে নাগাল্যানডের আরও অনেক গ্রামের কথা এসে যাচ্ছিল। ঘটনার বিন্যাসে হয়তো এখানে সেখানে একটু আধটু তফাৎ আছে—কিন্তু নাগাল্যানডের সব গ্রামেরই কাহিনী প্রায় একই রকম।

প্রধানমন্ত্রী, খুনুমা গ্রামের এ কাহিনী আপনি বিশ্বাস করলেন কি না কোনকালেই তা জানতে পারব না। সরকারী নথিপত্র একটু নেড়েচেড়ে দেখলে খুনুমা না হোক খুনুমার মতো অন্য অনেক গ্রামের কথা আপনি জানতে পারবেন। তবে খুন্নুমার লোকদের কথায় কথায় আমি সেদিন যখন এ কাহিনী শুনছিলাম— এই প্রসঙ্গে একটু অন্য প্রসঙ্গে আরেকটু—একটু একটু করে যখন ছবিটা ফুটে উঠছিল—তখন এ-কাহিনীর সত্যাসত্যের কথা আমার মাথায়ই আসেনি। সেদিন রাত নয়টা নাগাদ জিপে করে খুন্নুমা থেকে ফেরবার সময় আমরা সবাই চুপচাপ ছিলাম। অতি সন্তর্পণে কয়েকটা কাঠের বাঁক পেরিয়ে চিটু হুরবে এক সময় মুখ খুলল: আচ্ছা, এত সবের পর খুন্নুমা কেন দিল্লির আনুগত্য মানতে যাবে বলতে পারো? কিংবা দিল্লির আনুগত্য মেনে নিলে এই খুন্নুমার কি লাভ হবে অনুমান করতে পারো?

দ্বিতীয় ছবি: অরুণাচলের সুবনসিরি ডিভিশনে জিরো থেকে মাইল দেড়েকের মধ্যেই বর্ধিষ্ণু আপাতানি গ্রাম—লিজা। জিরোয় কেউ এলেই সরকারী ব্যবস্থাপনায় তাকে লিজা দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদেরও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ১৯৬৯ সনে। গাড়ি বড় রাস্তার উপর নেমে ফার্লংটাক পথ ক্ষেতের আল ধরে এগোলে লিজা গ্রাম। আপাতানিরা এখনো লং হাউসে বাস করে। লং হাউস মানে বাঁশের উঁচু মাচার উপরে বাঁশের লম্বা ঘর। ঘরের ভেতরে খানিকটা করে জায়গা ছেড়ে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, এমনকি ছয়টা বা আটটা চুল্লি। এক একটা চুল্লি

কেন্দ্র করে এক একটি স্ত্রীর সংসার। হারেম, ডরমিটোরি, গেষ্টহাউস ইত্যাদি সব নিয়ে এক একটা লং হাউস। দৈর্ঘ্যে যার হাউস সব চাইতে বড়ো, গ্রামেও তার প্রতিপত্তি সব চাইতে বেশি। আপাতানি মেয়েরা এক সময়ে নাকে ও কানে ভারি ভারি কাঠের অলঙ্কার লাগিয়ে নিজেদের চেহারা বিকৃত করে দিত। অন্যান্য উপজাতীয়রা আপাতানি সুন্দরীদের চুরি করে নিয়ে যেত বলেই আপাতানি সমাজের এই অনুশাসন ছিল। কিন্তু এই অনুশাসন সম্প্রতি অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে। বিশেষ করে যে সব মেয়েরা জিরোর স্কুলে পড়তে যায় তারা এখন নিজেদের মা মাসীর চেহারা দেখলেও শিউরে ওঠে। গায়ে গায়ে লাগানো লম্বা লম্বা বাঁশের লং হাউস, সরু সরু গলি, গ্রামের মাঝখানে পূজো ও উৎসবের প্রাঙ্গণ—এই সবকিছু নিয়ে লিজা এখনও প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাছাকাছি আছে। একটু দূর থেকে দেখলে লিজা গ্রামটিকে আজও একটি বিরাট ময়লার স্তূপ বলে মনে হয় -গ্রামের ভিতরে ঢুকলে অজস্র অসংখ্য মাছি প্রতিনিয়ত উপমাটির কথা মনে করিয়ে দিতে থাকে। কিন্তু লিজা গ্রামেরও কোন কোন ঘরে আনুষ্ঠনিক সভ্যতার হাওয়া ঢুকতে শুরু করেছে।

অরুণাচলের অন্য দশটি উপজাতির তুলনায় আপাতানিরা চিরকালই খুব চৌকস। ব্যবসায়ে ওদের খুব মাথা খোলে। কো-অপারেটিভ চালিয়ে, ট্রান্সপোর্টের ব্যবসায়ে, আড়তদারি করে আপাতানি সমাজের কেউ কেউ এখন রীতিমত বিত্তবান। আমরা গাঁওবুড়ার আদিগন্তবিস্তৃত লং হাউসে ঢুকে বসলে তিনি এক প্যাকেট গোল্ডফ্লেক সিগারেট ও এক বোতল ব্ল্যাক নাইট হুইসকি বের করলেন। সবিনয়ে হুইসকি প্রত্যাখ্যান করে আপং (আপাতানি রাইস বীয়র) আছে কি না জিজ্ঞেস করায় তিনি অকপটেই একটু বিরক্ত হলেন। আপং তবু এসে গেল, তিনি একটা হাঁক দিতেই পাঁচ নম্বর চুল্লি থেকে বারো বছরের একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে চার কলসি আপং দিয়ে গেল।

আপাতানিদের সঙ্গে নেফা প্রশাসনের কখনও কোন ঝগড়া বিবাদ হয় নি। এমন কি ১৯৬২-৬৩ সনে আপাতানিদের কেউ কেউ চীনের সঙ্গে ব্যবসা-পত্তর শুরু করেছিল একথা জানবার পরেও সে সম্পর্কে কিছুমাত্র চিড় খায়নি। এই আপাতানি ছবিটার সঙ্গে ডাফলা, গ্যালং, মোনপা এবং আরও দশটা উপজাতির ছবি দেখাতে পারলে আপনি বুঝতে পারতেন আমাদের নেফা প্রশাসন কত করিৎকর্মা। কামেং, তিরাপ এবং সুবনসিরি এই তিনটি ডিভিসনের বিস্তৃত এলাকায় আমি গেছি। বিভিন্ন উপজাতির ঘরে বসে আমি আরা অথবা আপং খেয়েছি। মাতব্বরী করার ইচ্ছে না থাকলে এই ট্রাইবালদের আস্থাভাজন হওয়া কঠিন কিছু নয়। গায়ে পড়ে ওদের ভালো করতে গেলেই ওরা চটে যায়, ক্ষেপে ওঠে। আপনার ব্যুরোক্রাটরা মাঝে মাঝে ২৬ জানুয়ারী কিম্বা ১৫ অগাষ্ট—হঠাৎ ওদের সামনে আবির্ভূত হন, দামী দামী উপদেশ দেন, কিছু কিছু দান খয়রাতও করেন। কিন্তু, তাতে ওদের মন ভেজে না, ওদের মনের কথাটাও জানা যায় না। অথচ ওদের সঙ্গে একবার অনাড়ম্বরে মিশে যেতে পারলে, বসে মিথুনের মাংস সহযোগে দু পাত্র আপং খেলে, আপনা থেকেই ওদের অন্তঃপুরের আগল খুলে যায়। ওদের সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করলেই বোঝা যায় যে ওরা প্রশাসনকে কোন চোখে দেখে। অরুণাচলের এই সব ট্রাইবালরা এখনো বিচ্ছিন্ন এবং দুবল—এরা তাই এখন নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। প্রশাসনের যত বিস্তার ঘটছে, এরাও ততই নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছে সরে যাচ্ছে। এদের বিদ্বেষও বাড়ছে। কিন্তু অনন্তকাল ধরে এমনটা চলতে পারে না, চলবে না। নাগাল্যানডে চলেনি, মিজোরামে চলছে না। বাইরের প্রভাব এদের উপর পড়বেই—চারচ না এলেও সি. আই. এ আসবে, কে-জি বি ও আসবে—আর চীন তো ১৯৬২-৬৩ সনেই বীজ বপন করে গেছে। ব্যুরোক্রাটদের চোখের আড়ালে সে বীজ বেশ দ্রুত অঙ্কুরিতও হচ্ছে। প্রশাসনের প্রতি ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষের

চাপে এবং তাপে অরুণাচলের বিচ্ছিন্ন ট্রাইবালরা একদিন সংঘবদ্ধ হবেই। তারপরে নাগাল্যানডের মতো বা মিজোরামের মতো ফেটে পড়বে। পেয়ারের আপাতানিরা তখন সুবিধে বুঝলে ওদের দিকে ভিড়ে যাবে। তখন আবার ব্যুরোক্রাটরা ওদের নেমকহারাম বলবে, অসভ্য বলবে। সেনাবাহিনী ছুটে আসবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য।

পূর্বাঞ্চলের উপজাতিদের সম্পর্কে আমাদের কি নির্দিষ্ট কোন পলিসি আছে? বা কোন গাইডলাইন? থেকে থাকলে সেটা কি? অদ্যাবধি কোথায়ও সেইটে প্রয়োগ করা হয়েছে?

পূর্বাঞ্চলের উপজাতিদের সঙ্গে আমি অন্তত দশ বৎসর বেশ অন্তরঙ্গভাবে মিশেছি, কিন্তু এই প্রশ্ন দুটিব কোন জবাব পাইনি। আপনার ব্যুরোক্র্যাটরা এসব প্রশ্নের কোন জবাব দেন না।

অরুণাচলের আরও দুটি একটা ছবি দেখাবার ইচ্ছে ছিল। বিশেষ করে দিরাং জঙের ছবিটা: মোনপাদের এক প্রাচীন বসতি এই দিরাং জং। অতি প্রাচীনকাল থেকেই মোনপারা তিব্বতের লামাবাদে বিশ্বাসী। দিরাং জংএর (জং মানে দুর্গ) সামরিক গুরুত্বও প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত। ১৯৬৩-৬৩ সনে চীনের হাতে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হবার পর আমাদের সেনা বাহিনীও স্থানটির গুরুত্ব মেনে নিয়েছে। দিরাং জঙে আমাদের সেনাবাহিনীর বিরাট একটা ঘাঁটি আছে। এখানে নেফা প্রশাসনেরও অনেক শাখা-প্রশাখা। ১৯৬২-৬৩ সনে দিরাং জং কিছুকাল চীনা অধিকারে ছিল।

চীনেরা এসে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দিরাং জঙের এতকালের সবকিছু তছনছ করে দিয়ে গেছে। মগজ ধোলাইয়ের যে কত কুটিল পথ আছে। মোনপাদের ওরা শিখিয়ে দিয়ে গেছে কেমন করে মান্ধাতার আমলের কোদাল কুড়ুল দিয়েই খেতে জলসেচ করা যায় (নেফা প্রশাসন একবার একটা মোটর-পামপ এনেছিল যেটা যান্ত্রিক গোলযোগের দরুণ চালুই করা যায়নি)। গ্রাম কেমন করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় চীনেরা সেইটেও মোনপাদের শিখিয়ে দিয়ে

গেছে। চীনে সৈন্যরা খেত থেকে শস্য কেটে এনে তা মোনপাদের গোলায়ও তুলে দিয়ে গেছে। এমনিতে বেশি কথা বলত না চীনেরা, কিন্তু রোজই বিকেলে মিটিং করে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিত। সেই সব মিটিঙে উপস্থিত হবার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, কিন্তু গোম্ফা থেকে ডাবা'রা মানে হবু লামারাও এসে সেই সব মিটিঙে যোগ দিত। গোম্ফার বাইরে স্রেফ গ্রামবাসীদের জন্য চীনেরা একটা স্কুল বসাবারও তোড়জোর শুরু করেছিল কিন্তু সেই সময়েই হঠাৎ ওরা সবকিছু ছেড়ে চলে যায়। স্কুলটা আর হয়ে ওঠেনি, কিন্তু মোনপারা সেই থেকে চীনে পদ্ধতিতেই খেতে জলসেচ করে। তাছাড়া দিরাং জঙে এখন আর মাছির উপদ্রব নেই। চীনেরা দিরাং জঙে দুই মাসেরও কম সময়ে যা করে গেছে আমরা প্রায় তিন দশকেও তা করে উঠতে পারিনি। পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ী উপজাতিদের সঙ্গে—তাদের কি অভাব কি অভিযোগ, কি আশা কি আকাঙ্ক্ষা—আমাদের ব্যুরোক্র্যাটদের আজ পর্যন্ত পরিচয়ই হয়নি। ব্রিটিশদের কাছ থেকে পড়ে পাওয়া চশমা দিয়েই আমরা উপজাতিদের দেখি, সেই মতোই তাদের সঙ্গে ব্যবহার করি। নাগাল্যানড এবং মিজোরাম সত্ত্বেও পূর্বাঞ্চলে ট্রাইবাল সংকটের ষোলকলা এখনও পূর্ণ হয় নি। তবে শেষের সেদিন আর খুব দূরে নেই।

কোহিমায় সেদিনের আড্ডায় ততক্ষণে আমরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। প্রেস কনফারেনসে জিগেস করব বলে যে কয়টা পেটেন্ট প্রশ্ন গুছিয়ে রেখেছিলাম সেগুলোও ততক্ষণে এলোমেলো হয়ে গেছে। রাত দশটায় রাজভবন থেকে টেলিফোনে খবর পাঠানো হল—কাল সকাল আটটায় হেলি-প্যাডের লাউনজে প্রাইম মিনিস্টারের প্রেস কনফারেনস।

খবরটা যখন এল তখন আমি ১৯৭২ সনের মিজোরামে। তার কিছুদিন আগেই মিজোরাম ইউনিয়ন টেরিটোরি মানে কেন্দ্রশাসিত এলাকা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে—তার আগে ছিল

আসামের মিজো হিল্‌স্ ডিসট্রিকট। এই নামান্তর বিনা রক্তপাতে ঘটেনি।

আমরা সেবার আইজলে গিয়েছিলাম ইউনিয়ন টেরিটোরি হবার পর মিজোরাম বিধান সভার প্রথম নির্বাচন কভার করতে। মিজোরাম সম্পর্কে, মিজোদের সম্পর্কে তখনো আমরা কেউই প্রায় কিছুই জানতাম না। মানে, সরকারী হ্যানড-আউট পড়ে যতটুকু জানা যায় ততটুকুই জানতাম। মানে, যেটুকু জানতাম, সেটুকুও ভুল জানতাম। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? আমরা সকলেই অভিজ্ঞ সাংবাদিক। আইজলে পৌঁছেই মিজোরামের অবস্থা, মিজো বিদ্রোহের ছিন্নভিন্ন অবস্থা, মিজোদের কত পারসেনট কংগ্রেসকে ভোট দেবে আর কত পারসেনট মিজো ইউনিয়কে এবং এই ধরণের আরো অনেক জটিল বিষয় নিয়ে আমরা লম্বা লম্বা রিপোরট ভেজতে শুরু করে দিলাম। আমাদের কেরামতিও ব্যুরোক্র্যাটদের চাইতে নেহাত কম নয়।

তবে রিপোরট যে যেমনই পাঠাই না কেন, মিজোরাম যে সুস্থ নয়, শান্ত নয় আমরা তা আইজলে পৌঁছেই বুঝতে পেরেছিলাম। আইজলে পৌঁছে যে কোন বোবা-কালাও তা এক লহমায় বুঝে যেত। মিজোরা মিজোদের মতো চলাফেরা করছে, ভারতীয়রা ভারতীয়দের মতো—উভয়ের মাঝখানে পুঞ্জীভূত অবিশ্বাস ও ঘৃণা এমনই জমাট যে তা প্রায় ছুরি দিয়ে কাটা যায়। এই বিদ্বেষের অনেক কারণ আছে। আসামের অপশাসন, উত্তর ভারতীয় অফিসারদের অপদার্থতা, ব্যওসায়ী আর ঠিকাদারদেব শিকড় বিস্তার ইত্যাদি এবং আমাদের সেনাবাহিনী। এই সেনাবাহিনীর উদ্ধত উপস্থিতিটা অন্ধেরও চোখে পড়বার মতো—লাইট মেশিনগান নিয়ে দলে দলে শহরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, সর্বক্ষণ। গ্রামাঞ্চলে এই সেনা বাহিনীর দাপটের থেকে মেয়েদেরও নিস্তার নেই।

সেবার মিজোরামে পৌঁছেই আমি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলাম—

অতি সামান্য একটি ঘটনায়। ঘটনাটি এই রকম : আইজলে পৌঁছান মাত্রই নানাদিক থেকে আমাদের কানে এল যে গত জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কে, সি, পন্থ কথা দিয়েছিলেন সব মিজো বিদ্রোহী বন্দীকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। জানুয়ারীর পর এপ্রিল গড়িয়ে গেল অথচ এখনো একজন বন্দীকেও মুক্তি দেওয়া হয়নি। মিজোরা এতে তেমন বিস্মিত হয়নি– ভারতীয়দের কাছ থেকে অন্য কিছু আশা করাই তো বাতুলতা! কিন্তু এই ঘটনায় ভারতীয়দের সম্পর্কে ওদের অবিশ্বাস আরও ঘনীভূত হয়েছে। আমাদের, আমাকেও সবাই মিথ্যেবাদী ভাবছে—ব্যাপারটা খুবই অস্বস্তিকর।

তবে ভাগ্যক্রমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কে, সি, পন্থও তখন আবার আইজলে নিবাচনের প্রস্তুতি সরেজমিনে দেখতে এসেছেন। একটা ডিনাব পার্টিতে তাব সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল। আমি একটু উত্তেজিত ছিলাম, উত্তেজিত কণ্ঠেই তাঁকে ঘটনাটিব কথা বললাম। বললাম, পাহাড়ীরা এমনিতেই আমাদেব বিশ্বাস করে না। তাব উপরে আমরা যদি কথা দিয়ে কথা না রাখি তবে— ।

স্ববাষ্ট্র মন্ত্রী আমাকে আর কথাটা শেষ কববার সুযোগ দিলেন না। খাবারের ডিশ হাতে ডেপুটি কমিশনার নিকটেই বিচরণ কবছিলেন। কিন্তু আইজল জেলে কয়জন বৈবী মিজো আটক আছে তিনি তা বলতে পারলেন না। এস, ডি, ও-ব ডাক পড়ল। তিনিও কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে বললেন, কাল সকালেই অ্যাকচুয়াল ফিগারটা মন্ত্রী মহাশয়কে জানিয়ে দেবেন। ততক্ষণে আমার রাগ জল হয়ে গিয়েছিল। একটু হেসে আমি অফিসারদের সামনেই পন্থ সাহেবকে বললাম, 'এই তো আপনাব অফিসারদের এফিসিয়েনসিব নমুনা।'

এবপরে উত্তেজিত হবার পালা কে. সি পন্থের। ডি সি. এবং এস. ডি. ও-কে এক দাবড়ানি দিয়ে তিনি বললেন, কয়জন বৈরী

মিজো জেলে আছে তা আর তিনি জানতে চান না। তিনি জানতে চান কয়জন বন্দীকে ছেড়ে দেওয়া হল।

মিজোরামে কোন কথাই চাপা থাকে না। ডিনার পারটির এই ছোট্ট ঘটনাটুকুর কথাও আধঘণ্টার মধ্যে সবাই জেনে গেল। আইজলে ডজনখানেক দৈনিক কাগজ আছে, পরদিন তার সব কয়টিতেই আমি হেড লাইন।

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটির কথা আরও সংক্ষেপে বলব। বৈরী মিজোদের যে মুহূর্তে ধারণা হল যে আমি লোকটা খুব খারাপ নই তখন থেকেই ওরা সব কিছু বেশ খোলাখুলি বলতে শুরু করল। আমার আগ্রহ ছিল একজন বিদ্রোহী মিজো নেতার ইনটারভিউ নেব, যদি সম্ভব হয়। একবার এদের আস্থা অর্জন করতে পারলে তারপরে সব কিছুই খুব সহজে সম্ভব হয়। ব্যবস্থা মতো এর পরে একদিন আমি ব্রেকফাস্ট টেবিল থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলাম। পাহাড়ের বাঁকে একটা জীপ অপেক্ষা করছিল, সেটাতে কিছুদূর গিয়ে তারপর হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে আইজলের উপকণ্ঠে একটা রিগ্রুপড ভিলেজে পৌঁছলাম। একদা চীনে চিয়াংকাই-শেক এবং তারপরে দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমেরিকানরা এই ধরণের আদর্শ গ্রাম স্থাপিত করেছিল—বিদ্রোহীরা যাতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ না পায় সেজন্যই এ-ব্যবস্থা। এ-ব বস্থায় চীনে বা দক্ষিণ ভিয়েতনামে বিদ্রোহ রোখা যায়নি। মিজোরামে এই ব্যবস্থার সুযোগ বিদ্রোহীরা পুরোমাত্রায় গ্রহণ করছে।

নামে রিগ্রুপড ভিলেজ কিন্তু আসলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। ছোট একটু পরিসরে হাজার পাঁচেক মিজোকে আটকে রাখা হয়েছে। —বেরোতে ঢুকতে সবাইকে পাস দেখাতে হয়। নোংরা ঘিঞ্জি দুর্গন্ধময় পরিবেশ। যদিও নাম-কা-ওয়াস্তে ইস্কুল স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি সবকিছুই আছে। এখানে কিছুদিন থাকতে বাধ্য হলে বিদ্রোহীদের প্ররোচনা ছাড়াই যে কেউ বিদ্রোহী হয়ে উঠতে বাধ্য। কীভাবে,

কেমন করে এই আদর্শ গ্রামে ঢুকে আমি একজন বিদ্রোহী মিজো নেতার সঙ্গে দেখা করেছিলাম তার বিশদ বিবরণ দেবার উপায় নেই। কথার খেলাপ করতে পারব না। কিন্তু এই আদর্শ গ্রামগুলোই যে বিদ্রোহীদের সবচাইতে সক্রিয় আড্ডা সেইটে এক মুহূর্তেই বুঝে গিয়েছিলাম। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা বলতে যে কি বোঝায় তা আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝে গিয়েছি। মিজোরামে এফিসিয়েণ্ট ব্যুরো-ক্র্যাটরা বিদ্রোহ দমনের যত চেষ্টা করছেন বিদ্রোহ কেন ততই ছড়িয়ে পড়ছে আশা করি এরপরে কাউকে আর সে কথা বুঝিয়ে দিতে হবে না। ব্যুরোক্র্যাটদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

এরপরে হঠাৎ এক সময় সকাল হয়ে গেল। চোখমুখে জল ছিটিয়ে আমরা তড়িঘড়ি গিয়ে কোহিমা হেলিপ্যাডে হাজির হলাম। প্রধানমন্ত্রী যথাসময়ে এসে একটা চৌকির উপরে বসলেন। সিকিউরিটির লোকেরা চারদিকে ঘুরঘুর করতে থাকলেও, ফিকে আকাশী রঙের একটা শাড়িতে সেদিন তাঁকে রাজরাণীর মতো দেখাচ্ছিল।

সমবেত সাংবাদিকদের উপর একবার ক্ষমা-সুন্দর চোখ বুলিয়ে তিনি সকৌতুকে বললেন, ইয়েস, জেনটলমেন!

কয়েকটা গুরুপাক প্রশ্ন তখনও আমার মাথায় খুব জোর ঘুরপাক খাচ্ছে। তার আলতো দৃষ্টি অবশেষে আমার উপর এসে পড়তেই আমি হকচকিয়ে জিগেস করে ফেললাম:

'আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন যে সেনাবাহিনীর সাহায্যে কোথায়ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা বা বজায় রাখা সম্ভব?'

এমন সুন্দর সকালে কেউ যে এমন বিদঘুটে প্রশ্ন করতে পারে তিনি হয়তো তা ভাবতেও পারেন নি। ক্ষমাসুন্দর চোখ দুটি মুহূর্ত মধ্যে রোষকষায়িত হয়ে গেল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে তিনি জিগেস করলেন, 'আপনার নাম কী? কোন কাগজের প্রতিনিধি আপনি?'

সবই সবিস্তারে নিবেদন করলাম। তিনি তখন প্রশ্নটা আবার

রীপিট করতে বললেন। এই প্রতিবেদনে যত কিছু লেখা হয়েছে এবং যতকিছু লেখা হয়নি তার সব দু'একটি কথায় বোঝাবার চেষ্টা করে আমি আবার বললাম, 'নাগাল্যানডে সেনাবাহিনীর এই যে বিরাট ব্যাপক উপস্থিতি, এইটে কি নাগা-সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের অন্তরায় নয় ?'

ব্যস। তিনি স্রেফ ফেটে পড়লেন, 'অন্যান্য দেশ (মানে চীন অথবা পাকিস্তান) যখন সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করে তখন তা আপনাদের চোখে পড়ে না। কেবল ভারত তার সীমান্ত সুরক্ষিত রাখবার চেষ্টা করলেই তখন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।' ইত্যাদি।

প্রধানমন্ত্রী, আমার প্রশ্নের সঙ্গে আপনার এই জবাবের সম্পর্ক কোথায় সেদিন তা বুঝতে পারিনি।

আজ পারি। হেরে গেলে এবং হার স্বীকার করবার সাহস বা উপায় না থাকলে চটে উঠতেই হয়। কোহিমায় সেদিন আপান দারুণ চটে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন আর একটু সুযোগ পেলে আমি আর একটামাত্র প্রশ্ন করতাম, 'নাগা, মিজো এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য উপজাতিদের নিয়ে যে সমস্যা তা সমাধানের কোন উপায় আপনার জানা আছে কি ?'

বেশ কিছু দিন হয়ে গেল সিকিম বিধানসভার নির্বাচনপর্ব মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে সমাধা হয়েছে। সামান্য টালবাহানার পর সেখানে একটি বৈধ ও জনপ্রিয় সরকারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপরে আব সিকিম নিয়ে নতুন কোন উদ্বেগর কারণ এখনো ঘটেনি।

এই সিকিম নিবাচনের ফলাফল যে দিল্লির সরকারী মহলের মনোমত হয়নি তা বলাই বাহুল্য। সিকিমের অবিসংবাদী নেতা বলে খ্যাত কাজী লেনডুপ দোরজি যে সদলবলে এমন মর্মান্তিক-ভাবে ধরাশায়ী হবেন সে-অশঙ্কা আরও অনেকেরই অনুমানের বাইরে ছিল। নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল দেখে তাই দিল্লি ও গ্যাংটকের কর্তাব্যক্তিদেব চোখ যদি হঠাৎ ঝলসে গিয়ে থাকে তবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। বরং তাঁরা যে ঝোকের মাথায় সিকিমে নতুন কোন হঠকাবিতা করে বসেননি সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ দেওয়া চলে। এ সম্পর্কে প্রথমটায় কিন্তু তেমন ভরসা ছিল না। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার পর, সিকিম জনতা পরিষদ দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগবিষ্ঠতা লাভের পরেও, নতুন সরকার গঠন করবাব জন্য কা'কে প্রথম ডাকা হবে তাই নিয়ে নানা মহলে নানারকম সংশয় প্রকাশ করা হতে থাকে। দিল্লীর প্ররোচনাতেই সব সংশয়ের ঘুড়ি ওড়ানো হয়েছিল এমন অভিযোগ করবার মতো কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ নেই। অতএব, দলত্যাগীদের উৎসা হত করবার জন্যই এই গড়িমসি —এমন অভিযোগ করাও অন্যায় হবে।

এমনিতে কাজী লেনডুপ দোরজির এই নিরঙ্কুশ পবাজয়ে দিল্লির তেমন বিচলিত হবার কথা নয়। তবে অপ্রস্তুত বোধ করবার সংগত কারণ আছে। এই নিবাচনে অন্তত এটুকু বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে,

দিল্লির সিকিম পলিসি আগাগোড়াই ভুলে ভরা। প্রমাণ হয়েছে যে, সিকিমের প্রতিটি ব্যাপারে দিল্লির নাক গলানো সিকিমবাসীরা পছন্দ করে না। সাব্যস্ত হয়েছে যে এতাবধি সিকিমকে তাঁবে রাখবার জন্য যত কিছু দেওয়া হয়েছে তার সবকিছুই ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। অবশ্যই আমাদের রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক নেতাদের পক্ষে এত বড় একটা ভুল এক কথায় মেনে নেওয়া সম্ভব হতে পারে না। প্রবল পক্ষ ভুল করলে তারপর স্বাভাবিকভাবেই প্রবলতর উপায়ে তা ঢাকা দেবার চেষ্টা করে—এই উপমহাদেশেই তার বহু বহু সাম্প্রতিক উদাহরণ আছে। সিকিমেও ঠিক সেরকম কিছু ঘটবারই ষোল আনা আশঙ্কা। যথাসময়ে এ-প্রসঙ্গ আলোচিত হবে।

তার আগে নির্বাচনের ব্যাপারটা আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক। আভাসে ইঙ্গিতে বলা হয়ে থাকে যে নির্বাচনে জয়ী জনতা পরিষদ দলের আসল প্রাণপুরুষ হলেন সিকিমের ভূতপূর্ব চোগিয়াল—সিকিমের ভারতভুক্ত এই দল মনে-প্রাণে স্বীকার করে না—সে কারণেই উদ্বেগ। সিকিম ভারতের সীমান্ত রাজ্য। তিব্বতের লাসা থেকে এই কলকাতায় আসবার সবচাইতে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পাকা-সড়কটি এই সিকিমের মধ্য দিয়ে। দেশের নিরাপত্তার দিক থেকে, তথা সামরিক বিচারে, সিকিমের অপরিসীম গুরুত্ব। আর সেখানে যদি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা হঠাৎ একটা হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে তবে সত্যিই ভরাডুবি! এ-ক্ষেত্রেও মুশকিলের একমাত্র আসান হল নিজেদের অতীত নীতির ভুল স্বীকার করে নিয়ে তারপর ঠাণ্ডা-মাথায় অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে নতুন সিকিম নীতি নির্ধারণ করা। কিন্তু প্রবল পক্ষ কখনো নিজের ভুল স্বীকার করে না আমাদের আমলাতন্ত্রও এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সেয়ানা।

অপরদিকে নির্বাচনে যদি নর বাহাদুর ভাণ্ডারীর জনতা পরিষদ দলের পরিবর্তে ভীম বাহাদুর গরুঙের সিকিম বিপ্লবী কংগ্রেস দল

নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করত—মাত্রই গোটা তিনেক আসনের ব্যবধান ঘটলেই ঘটতে পারত—তাহলে কি হত ? সেক্ষেত্রেও উদ্বেগ হত। তবে যেহেতু চোগিয়ালের সঙ্গে গুরুঙের অহি-নকুল সম্পর্ক, সেজন্য তাহলে তখন ধুয়ো ধরা হত যে এরা ভেতরে-ভেতরে মহা-নেপালের স্বপ্ন দেখে। সিকিমের শতকরা ৮০ জন লোক নেপালী এখানে যদি মহা-নেপাল আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে তাহলে তো সর্বনাশ।

এখানেই আরও একটি কথা বলে রাখা দরকার। সেটি হল সিকিম জনতা পরিষদ দলের বিচ্ছিন্নতাকামী মনোভাব সম্পর্কে এদেশের পত্র-পত্রিকায় যে-সব আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে বা হচ্ছে সেসব নিয়ে আমাদের এখনই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবার প্রয়োজন নেই। শাসক দলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটি তুলেছেন নির্বাচনে পরাজিত কতিপয় রাজনৈতিক নেতা—এদের কথায় কোনরকম গুরুত্ব আরোপ করা যে যুক্তিসঙ্গত নয় তা সাংবাদিকেরাও জানেন। সুদীর্ঘকালের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এ-ধরনের রটনা সরকারী তরফ থেকেই নানা কৌশলে রটিত হয়ে থাকে। এসব রটনা যে সব সময়ই অমূলক হয় তা নয়, তবে উপস্থিত ক্ষেত্রে উপস্থিত রটনাটি একেবারে অভ্রান্ত তাও মনে করার কোন কারণ নেই। একথা ঠিক যে নির্বাচনী প্রচারে জনতা পরিষদ দল কাজী লেনডুপ দোরজির বাপান্ত করবার ছলে মুহুর্মুহু সিকিমের ভারতভুক্তির তীব্র সমলোচনা করেছে। একথাও ঠিক যে এই দলের পিছনে চোগিয়ালের অর্থ ও আশীর্বাদ দুই-ই আছে। তবে ভারতভুক্তির ব্যাপারটা যে সত্যই দুস্পাচ্য সে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইও অকপটে কবুল করেছিলেন, আর অমন একটা ব্যাপার নিয়ে সিকিমে কোন রকম সংশয়ই থাকবে না এমন আশা করাও বাতুলতা। কিন্তু তাই বলে জনতা পরিষদ দল অনতিবিলম্বে একটা আন্দোলন শুরু করবে এমন ভয় পাবারও কোন কারণ নেই। সিকিমের সঙ্গে এ-বিষয়ে নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মণিপুর বা ত্রিপুরার তুলনা চলে

না। ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটা অতি-গুরুত্বপূর্ণ ধমনী এই সিকিম—এখানে কোনরকম বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলন চালাতে যাবার পরিণাম কি হতে পারে তা অনুমান করবার ক্ষমতা চোগিয়াল বা জনতা পরিষদ দলের আছে বলে নেওয়া যেতে পারে।

তা ছাড়া, সিকিমের অধিকাংশ লোকই এই ভারতভুক্তির বিরোধী এমন না-ও হতে পারে। মনে রাখা দরকার যে, ভারত-ভুক্তির পরে সিকিমে প্রথম যে নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে কাজী লেনডুপ দোরজির দল বিধানসভার সবকয়টি আসনে জয়লাভ করেছিল। সেই নির্বাচনে নিশ্চয়ই অনেক কারচুপি হয়েছিল। কিন্তু কারচুপি করে শতকরা একশোটা আসনেই জয়লাভ করা—নির্বাচনে কমিশনকে ধন্যবাদ—এদেশে এখনো পর্যন্ত সম্ভব নয়। অতএব নির্বাচন দুটির সম্পূর্ণ বিপরীত ফলাফল নিয়ে খটকা থেকেই যায়। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, যে প্রথমাবস্থায় সিকিমবাসীরা চোগিয়ালের মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-শাসনে সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিল। গণতান্ত্রিক ভারতের সঙ্গে একত্র হবার সুযোগ পেয়ে স্বভাবতই সিকিমের উন্নতির সোপান বলে মনে হয়ে থাকতে পারে। তারপর আমাদের আমলাতান্ত্রিক শাসনেব মহিমা বুঝতে পেরে-নিশি না পোহাতেই—সিকিম হয়তো আবার মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের সুশৃঙ্খল শোষণের দিনগুলিতে ফিরে যেতে চায়। এমন হতেই পারে কেননা সিকিমেব সামনে আর তৃতীয় কোন বিকল্প নেই। এ ধরনের ঘটনা ইতিহাসে এর আগেও বহুবার ঘটেছে। ভারতবর্ষে হয়তো ঠিক বর্তমান মুহূর্তেই তেমন একটি ঘটনা ঘটছে—কুলোর বাতাস দিয়ে একদিন যাকে তাড়ানো হয়েছিল সেই কুলো সাজিয়েই হয়তো তাকে আবার বরণ করা হবে।

যেদিক থেকেই বিচার করে দেখা যাক, সিকিমের সাম্প্রতিক নিবচানে জনতা পরিষদ দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে তড়িঘড়ি একটা বিপদের সূচনা বলে ধরে নেবার কোন যুক্তি নেই। এদের উপর

অবশ্যই সতর্ক নজর রাখা প্রয়োজন, সিকিমে সব কিছুর উপরই সদাসর্বদা সতর্ক নজর রাখা প্রয়োজন এবং সিকিমে তার সমারোহ পূর্ণ ব্যবস্থাও আছে—অতএব দিল্লির অথবা দিল্লির যেসব কর্তাব্যক্তির গ্যাংটকে বসে সিকিমের প্রশাসন চালু রাখেন তাঁদের পক্ষে আতঙ্কিত বোধ করবার আশা কোন সংগত কারণ নেই। সিকিমেও মিজোরামের মতো একটা সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করবার মতলব সদ্য নির্বাচিত জনতা পরিষদ দলের আছে, এমন গুজব বেপরোয়া কেউ হয়তো রটাতে পারে, কিন্তু তা কখনোই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।

আতঙ্কিত হবার পরিবর্তে সিকিমের ঘটনাক্রমে, দিল্লির বরং উল্লসিত হবার কথা। সংসদীয় গণতন্ত্রের বীজ রোপিত হবার পর এত অল্প দিনের মধ্যে তা এমন পত্র-পুষ্প-শোভিত হয়ে উঠতে পারে সে-কথা কবে কে ভাবতে পেরেছিল। দীক্ষা দানের দু-চার বছরের মধ্যেই এমন পাইকারি হারে দল পাল্টানো, এমন নিপুণতার সঙ্গে একেকটি রাজনৈতিক দলকে ভেঙে চার-ছয়টি দলে বিভক্ত করা, সব রকম কেতা-নীতি নস্যাৎ করে নির্বাচনী প্রচার, মায় পরাজিত হবার পর বৈদেশিক হস্তক্ষেপের জিগির তোলা, সকলের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এসব কাজ সমাধা করতে দিল্লির সময় লেগেছে প্রায় তিরিশ বছর। সিকিমের তৎপরতায় দিল্লির তো উল্লসিত হবারই কথা। পরিবর্তে দিল্লি, ঠিক আতঙ্কিত না হলেও, অন্তত কিছুটা অসুবিধায় যে পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দিল্লির এই অসুবিধার কারণ, এক কথায়, সিকিমের রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে কাজী লেনডুপ দোরজির আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত অন্তর্ধান। এই প্রবীণ নেতার অপসারণে সিকিমের রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক জীবনধারায় যে কোন স্থায়ী শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা নয়: তিনি ইতিমধ্যেই গ্যাংটক ছেড়ে তাঁর কালিমপঙের স্থায়ী-নিবাসে চলে গিয়েছেন, এবং সে খবর কোন কাগজই ছাপাবার

উপযুক্ত বিবেচনা করেনি। কিন্তু সিকিম সম্পর্কে দিল্লির যে চিন্তাধারা তার মধ্যে কাজী সাহেবের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা ছিল। কাজী সাহেব হঠাৎ সরে যেতে দিল্লি তাই একটু ফাঁপরে পড়ে গেছে। অবস্থাটা দিল্লি এখন কেমন করে সামলে দেয় সেইটেই দেখবার!

ব্রিটিশরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় পর্যন্ত সিকিম ছিল প্রায় একটা করদ রাজ্যের মতো। রাজা ছিলেন বর্তমানে চোগিয়ালের পিতা—যাঁর অনেকানেক প্রমত্ত ব্যাভিচারের কথা আজও লোকমুখে শুনতে পাওয়া যায়—তিনি কর আদায় করতেন, দেশ-বিদেশের প্রমোদকুঞ্জে ঘুরে বেড়াতেন এবং নাকি ছবি আঁকতেন। দেশের অভ্যন্তরীণ ভালোমন্দ ছিল সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধ গোম্ফাগুলোর হাতে—তাদের বৈভবের কোন অন্ত ছিল না। দেশের জনসাধারণ?—ওরা পাহাড় কেটে ক্ষেত তৈয়ারী করে, পাথর সাজিয়ে ক্ষেত রক্ষা করে, ক্ষেত কর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করে, বিভিন্ন খাতে কর-কর্জ শোধ করে, তারপর বাড়ি এসে কোদো (হালকা মদ) খায় আর ধর্মের লাটাই ঘোরায়। সকলের উর্দ্ধে ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের জবরদস্ত করাভয়। এই অনুকূল আবহাওয়াতেই সিকিম জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম। গোড়া থেকেই সিকিম কংগ্রেসের সর্বেসর্বা কাজী লেনডুপ দোরজি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গেও তখন থেকেই এর একটা অতি ক্ষীণ যোগাযোগ ছিল। সিকিমের বিত্তশালী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়ীরা গোড়া থেকেই এই কংগ্রেসেরও অন্যতম পৃষ্ঠপোষক।

কাজী সাহেব নিজেও বিত্তবান ব্যক্তি। চাকুং এলাকার প্রতাপশালী জমিদার। চোগিয়াল পরিবারের সঙ্গে টেক্কা দেবার ক্ষমতা রাখেন—বাসনাও প্রচুর—কিন্তু তার জন্য একটা বৈধ সংযোগ চাই। ব্রিটিশ-ভারতের সঙ্গে সিকিমের যে চুক্তি ছিল ১৯৪৭ সনে সেটি দিল্লির হাতে গচ্ছিত রেখে ব্রিটিশরা দেশে চলে গেল। তারপর

১৯২৯ সনে এই চুক্তির মেয়াদ যখন ফুরিয়ে এল তখন গ্যাংটকে কয়েকটি জনসভা করে কাজী সাহেব স্বয়ং দিল্লিতে এসে আবেদন জানালেন—সিকিমের সঙ্গে নতুন কোন চুক্তি না করে পুরো সিকিমকেই ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হোক। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কিছুতেই রাজি হলেন না,—এর পেছনে মাউন্ট-ব্যাটেনের কতটা কি প্রভাব-প্ররোচনা ছিল অথবা ছিল না তা আর আজ জানবার উপায় নেই। পুরানো চুক্তিটিকেই নতুন বয়ানে সাজিয়ে নিয়ে সিকিমে যেমন চলছিল তেমনি চলতে থাকল। কাজী সাহেবের প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন, দিল্লি কিন্তু কাজী সাহেবকে হাতে রেখে দিল—কবে কি প্রয়োজনে আসে কে জানে! দিল্লির তখনো দূরদৃষ্টি ছিল।

সিকিমে ব্রিটিশদের কোন অর্থনৈতিক স্বার্থ ছিল না। ওদের ভয় ছিল রাশিয়াকে নিয়ে—রাশিয়া যদি লাসাকে হাত করে সিকিমের পথে ভারতে এসে বাগড়া দেয়! ব্যাপারটিকে আজকে যেমন আজগুবী মনে হচ্ছে গত শতাব্দীর শেষের দিকে কিন্তু ততটা আজগুবী মনে হত না—অন্তত ব্রিটিশদের কাছে নয়। তা ছাড়া বিশ্ববাসীকে ভাঁওতা দেবার জন্যও ধূয়োটা তোলবার প্রয়োজন ছিল —ব্রিটিশদের অধীনে না থেকে ভারতবর্ষ যদি রুশদের অধীনে চলে যায় তবে কি তাতে বিশ্বের উপকার হবে? তবুও সিকিম বা তিব্বত নিয়ে ব্রিটিশদের উদ্বেগ ছিল ঠিক ততটুকু যতটুকু পড়তায় পোষায়। শুধু নজর রাখা যাতে বাইরে থেকে কেউ এসে ওই দুই দেশের লামাতন্ত্রী ঘোরটা কাটিয়ে দিতে না পারে। পূবদিকে চীন তখন নিজের মাথার ঘায়ে পাগল, উত্তরে রাশিয়ায়ও বিপ্লবের মহড়া চলছে—দক্ষিণে ভারতের দিকটায় ব্রিটিশরা কড়া পাহারা বসিয়ে দিল যাতে ভারতের দিক থেকে কেউ গিয়ে সিকিমকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে না পারে। ১৯৪৭ সনে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে

পর্যন্ত পড়শি সিকিমের সঙ্গে ভারতের কোন সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।

ব্রিটিশদের ছেড়ে যাওয়া ফাইল অনুসরণ করে, ব্রিটিশদের তয়ারী আমলাতন্ত্রের সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে, সিকিম যেমন চলছিল নিরুপদ্রবে তেমনই চলতে থাকল—১৯৪৯ পর্যন্ত। উপদ্রব না থাকলেও অযথা মাথা ঘামাবে, আমাদের আমলাতন্ত্র অমন জিনিসই নয়। অতএব ১৯৪৯ সনে ব্রিটিশ-ভারতের সঙ্গে সিকিমের চুক্তিটির মেয়াদ যখন ফুরিয়ে এলো, তখনো পর্যন্ত প্রতিবেশী সিকিম সম্পর্কে স্বাধীন ভারতের কোন পলিসিই ঠিক হয়নি। সেই সময়ে কাজী লেনডুপ দোরজির প্রস্তাব মতো যদি সিকিমকে সম্পূর্ণরূপে ভারতের মানচিত্রে টেনে নেওয়া হত, সর্দার প্যাটেলের মনোবাসনা যদি পূর্ণ হতো, তবে সেই সেদিন থেকেই সিকিম সমস্যার সূত্রপাত ঘটত—এবং এতদিনে হয়তো তার একটা নিষ্পত্তিও হয়ে যেত। কিন্তু আমাদের বিচক্ষণ আমলাতন্ত্র তখনই ততটা ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল না—লামাতন্ত্রের ঘেরাটোপটি তুললে ভেতর থেকে কী সব প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তু বেরিয়ে আসবে কে বলতে পারে! পণ্ডিত নেহরুও তাঁর এডওয়ার্ডিয়ান বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, আধুনিকতার কর্কশ ছোঁয়া থেকে এই সব আদিম সমাজব্যবস্থাগুলোকে সযত্নে রক্ষা করা প্রত্যেক সভ্যদেশের পবিত্র কর্তব্য। সবদিক বিচার করে সবচাইতে সহজ পথও ওইটেই। অতএব পুরানো চুক্তিটিকেই সামান্য মেজে-ঘষে নতুন করে সই-সাবুদ হল।

ওদিকে ওই ১৯৪৯ সনেই পৃথিবীতে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল—চীন বিপ্লব। এই ঘটনাটিকে দিল্লিতে তখন কে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছিল তা আর আজ কারও অজানা থাকবার কথা নয়। পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে চীন যখন সশরীরে এসে তিব্বতের দখল নিল—ভারত তখনও ঘুমায়ে রয়, আর ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে পঞ্চশীল

আওড়ায়। কিন্তু তাই বলে ইতিহাস তো আর থেমে থাকবে না—ওই দশকেরই শেষার্ধে বিভিন্ন সীমান্ত-সংঘর্ষে বেশ কিছু ভারতীয় জওয়ান নিহত হল। ঘটনা খুব দ্রুত ১৯৬২ সনের দিকে এগিয়ে চলল। নিতান্ত ভৌগোলিক কারণেই এই পরিবর্তনের ঢেউটা দারুণ নির্মমভাবে এসে আছড়ে পড়ল সিকিমের উপর। তিব্বত থেকে বঙ্গোপসাগরে পৌঁছবার সবচাইতে সংক্ষিপ্ত ও সহজ পথ এই সিকিম অতিক্রম করে প্রসারিত। সিকিমের, অর্থাৎ, ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করবার জন্য হুড়মুড় করে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। প্রথম কাজ পাহাড় কেটে পাথর ভেঙে রাস্তা তৈয়ারি করা সামরিক দ্রুততায়। কিন্তু সিকিমে দিন-মজুরের কাজ করবার লোক নেই বললেই চলে—লামা অর্থনীতিতে বেগার আছে, দিন-মজুর নেই। অগত্যা বাইরে থেকে নেপালী মজুর ডেকে আনতে হল। এই নেপালী মজুরদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হোল, একবার কোথাও গিয়ে একবার হাজির হলে আর নড়ে না, সেখানেই সংসার পেতে বসে যায়। জনবিরল সিকিমে অল্প সময়ের মধ্যেই জবরদস্ত সংখ্যা-গরিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল।

সিকিমে যে এই-ই প্রথম নেপালী অনুপ্রবেশ ঘটল তা নয়। তবে এই দফায় যে হারে অনুপ্রবেশ ঘটল তাকে যদি মুষলধারা বলা যায়, তা হলে এর আগে যা ঘটেছে তা ছিল নেহাৎ ইলশেগুঁড়ি। এর আগে যারা সিকিমে এসেছে, সিকিমের প্রয়োজন ছিল বলেই তারা এসেছে—সব দেশে সব সময়ই এমন জন-বিনিময় হয়ে থাকে—পাশ্চ্যাত্ত্যের নেশন-স্টেট থিয়োরির বিধি-নিষেধ দিয়ে এই গতায়াত রোখা যায় না—এমনি করেই বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে, নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয়। কিন্তু এইবারে যে-সব নেপলী ঝাঁকে ঝাঁকে এসে সিকিমকে ছেঁকে ধরল তারা এল ভারতবর্ষের হয়ে রাস্তা তৈরি করবার জন্য। এতে কেবল নতুন একটা সমস্যার সৃষ্টি হল—যে সমস্যার সমগ্র বীভৎসতা এইবার ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হবে।

এই ধরনের অযাচিত ও অনভিপ্রেত জলোচ্ছ্বাস কোন দেশ বা প্রদেশ কখনোই নির্বিবাদে মেনে নেয় না। অনেক সময় মেনে নিতে বাধ্য হয়—সিকিম যেমন হয়েছিল। জলোচ্ছ্বাসের এই সূচনা-পর্বে যদি কাজী লেনডুপ দোরজি সিকিমে ক্ষমতাসীন থাকতেন তবে কাজী সাহেবকেও এর প্রতিবাদ করতে হত। কপাল দোষে, এই সময়ে সিকিমের অধীশ্বর ছিলেন চোগিয়াল। এই সর্বনাশা উপদ্রবটি হাসি মুখে, এখানে-সেখানে রূপোর কাঁচি দিয়ে ফিতে কেটে মেনে নেওয়া ছাড়া চোগিয়ালের সামনে তখন আর অন্য কোন বিকল্প ছিল না। কিন্তু ভিতরে যদি ক্ষোভ থাকে, সেই ক্ষোভ যদি দিন দিন বেড়েই চলে, তবে একদিন তা ফুটে বেরোবেই—পারার মতো—বেরোবার কোন সহজ পথ না পেলে, বাঁকা টেরা হয়ে কিম্ভূতকিমাকৃতি নিয়ে ফুটে বেরোবে। সিকিমের আদিবাসী লেপচা-ভুটিয়ারাও এই বিশাল ও ব্যাপক নেপালী অনুপ্রবেশ চট করে মেনে নিতে পারেনি। বৌদ্ধ গোমফাগুলোও এই পরিবর্তনে আদৌ পুলকিত হয়নি—পায়ের তলা থেকে যে নিঃশব্দে মাটি সরে যাচ্ছে সেটুকু বুঝবার মতো বিষয়-বুদ্ধি লামাদের ছিল। এমন পরিবেশে উত্তেজনা জন্ম নেয়। শান্ত-সমাহিত সিকিম সেই থেকেই উত্তেজিত হয়ে উঠতে শুরু করে। এই উত্তেজনার তাপাঙ্ক এখনো সর্বনাশা স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছয়নি।

ওদিকে চোগিয়াল ওই সময়েই একটা সৌপর্দনীয় অপরাধ করে বসলেন। সি আই-এর যোগসাজসে চোগিয়াল ও আমেরিকার মধ্যে অবৈধ ঘনিষ্ঠতা কতদূর গড়িয়েছিল—কোন দিকে—আজ আর তা জানবার উপায় নেই, প্রয়োজনও নেই। চোগিয়াল এখনো তার খেসারত গুণছেন। তবে এই অপরাধেরও অন্য একটা দিক আছে। রাজ-মুকুটটি মাথায় আছে অথচ রাজদণ্ডটি সব-স্বত্ব-সমেত অপরের হাতে—এমন অবস্থায় যে কোন মাথায়ই একটু আধটু বিকৃতি দেখা না দিয়েই পারে না।

পড়শি এবং পরমাত্মীয় উদাহরণও সিকিমকে কিছুটা বিভ্রান্ত করে থাকবে। ব্রিটিশ আমলে ভুটানও ছিল একটি করদ রাজ্য, প্রায় সিকিমেরই মতো। কিন্তু কিছুটা ঐতিহাসিক এবং ততোধিক অনৈতিহাসিক কারণে, ভূটান কখনোই তেমনভাবে ব্রিটিশদের কৌতূহল আকর্ষণ করতে পারেনি—বন-বাঁদাড়, মশা, এমন কি হিমালয়েরও এখানে নগ্ন-নির্দয় রূপ কোথায়ও একটুকুও কোমল-কমনীয়তা নেই। কিন্তু সেই অনাদৃত ও অবজ্ঞাত ভুটানই ষাটের দশকের গোড়ার দিকে—কিছুর মধ্যে কিছু নয়—হঠাৎ কলম্বো প্ল্যানের সদস্য হয়ে গেল। তারপরে আবার গুটিগুটি রষ্ট্রসংঘের দিকেও এগোতে শুরু করল। বাইরের যেমন কাউকে মুরুব্বি ধরতে পারলে এসব খুব সহজ হয়ে যায়। এই সব ঘটনায় সিকিমের যদি চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটে থাকে তবে তা নিয়ে হইচই না করাই ভাল—পাড়ার পূজো কমিটির সভাপতি হবার জন্য বা সি-এ-বির মেম্বর হবার জন্য আমাদের দাদারা তার চাইতে অনেক বেশি আঁকুপাঁকু করে থাকেন। আর মুরুব্বি যদি ধরতেই হয় তবে আমেরিকাকে ধরাই ভাল—অনেক দিন থেকেই যে টোপ ফেলে বসে আছে। বৈবাহিক সম্পর্ক পাতিয়ে নান্দীমুখটা বেশ ভালোই হয়েছিল, কিন্তু তারপর তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সব কিছু কেঁচে গেল।

আগেই বলা হয়েছে, ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সিকিমের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কোন বেয়াদবি অধিক দূর গড়াতে দেওয়া চলে না। চোগিয়ালের পক্ষোদগমের শুলুনিটা অবাধ্য হয়ে উঠবার আগেই তাই দিললিকে সজাগ হতে হল। কিন্তু চোগিয়াল তার আগেই পেছোবার সব পুল কয়টি পুড়িয়ে বসে আছেন। ওদিকে ফুসলাবার অভিযুক্ত হবার আগেই মার্কিন চাচা হাত গুটিয়ে নিলেন। ষাটের দশকের শেষের দিকে চোগিয়ালের ভরাডুবি শুরু হয়ে গেছে। প্রাসাদের দারোয়ানরাও ক্রমে আর চোগিয়ালের বাধ্য রইল না।

একদিকে যখন চোগিয়ালের বিসর্জনের বাজানা বাজছে অপর দিকে তখনই কাজী লেনডুপ দোরজির আবাহনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। ষাট ও সত্তরের দশকের সেই সন্ধিকালে কাজী সাহেব তখন তার কালিম্পঙের চাকুং-হাউস থেকে সিকিমের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন। সিকিম জাতীয় কংগ্রেসের তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি— তাঁর বিদূষী-বিদেশিনী স্ত্রী, কাজিনী সাহেবা, তাঁর প্রধান পরামর্শ-দাতাও বটে—সিকিমের দ্রুত-বর্তমান নেপালী জনসংখ্যা তাঁর অনুগত। কাজী সাহেবের এই রাজনৈতিক উপস্থিতি ও প্রতিষ্ঠার পেছনে দিললির যে মদত ছিল একেবারে পাল্লা উল্টে দেবার মদত ওয়াকিবহাল মহল সে-কথা বেশ জোর দিয়েই বলে থাকে।

এরপরের ছক মাপা ঘটনাবলী ধাপে ধাপে এগিয়েছে।--এই জাতীয় ঘটনা ব্রিটিশ আমলেও একটু ভিন্ন পরিবেশে, একটু ভিন্ন চেহারায় বারংবার ঘটেছে এবং সে সবের আদ্যন্ত ফাইলে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে—একটু ঘাঁটলেই হল। সিকিমেও একেবারে ঘড়ি ধরে একদিকে চোগিয়ালের অস্তগমন চলতে থাকল আর অপর দিকে কাজী সাহেবের উদয় ঘটতে লাগল। একটার পর একটা গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী তুলে সিকিম জাতীয় কংগ্রেস ব্যাপক গণ-আন্দোলনের আহ্বান জানায়, গ্যাংটক বাজারে জনসভা হয়; দিললি প্রথমটায় বিরক্তি ও শেষপর্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করে, রাজতন্ত্র নিজেকে আরও একটু খর্ব করে গণতন্ত্রকে আরও একটু জায়গা ছেড়ে দেয়। দিল্লির অমোঘ মধ্যস্থতায় খেলাটা আর কিছুদিন চললে সিকিমের মুমূর্ষু রাজতন্ত্র আপনা থেকেই ফৌত হয়ে যেত। কিন্তু দিল্লি হঠাৎ অধৈর্য হয়ে পড়ল।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার অল্প কিছুদিন আগে দিল্লি কেন হঠাৎ সিকিমকে সম্পূর্ণরূপে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল আজও পর্যন্ত তার কোন বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তার দাবীও কেউ করেননি। চোগিয়াল কি আমেরিকার যোগসাজসে নতুন করে

কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন ? তাতে করে সিকিমে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কি বিড়ম্বিত হচ্ছিল ? সর্বতোভাবে পঙ্গু চোগিয়ালের পক্ষে, আমেরিকার সার্বিক সাহায্য নিয়েও স্থল-বন্দী সিকিমে বড়ো মাপের কোন গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলা সম্ভব ছিল—কোন মতলব না থাকলে এমন কথায় বিশ্বাস করা যায় না।

তবে কি কাজী লেনডুপ দোরজির গণ-আন্দোলনের তীব্রতায় বিচলিত হয়ে দিল্লি এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছে ? পুরো বিশ্বাস হয় না। একথা ঠিক যে আন্দোলনকারীরা গ্যাংটকের রাজ-প্রাসাদ অবরোধ করেছিল, রংপো এবং সিংটামেও বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিক্ষোভটা কেন কেবল রংপো সিংটাম গ্যাংটক-নাথুলা এই রাজপথটির উপরই সীমাবদ্ধ রইল—পশ্চিম সিকিমের বড়ো বড়ো শহর গেজিং বা নয়াবাজারে ছড়িয়ে পড়ল না—তা নিয়ে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। সেই সময়ে যেসব সাংবাদিক সিকিমে উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও নিঃসংশয়ে জানেন যে এই বিক্ষোভের পিছনে দিল্লির ষোল-আনা সমর্থন ছিল। এবং দিল্লি নাকি সেকথা গোপন রাখবার তেমন কোন চেষ্টাও করেনি। তাছাড়া, সামন্ত-তান্ত্রিক ঘোরে আচ্ছন্ন সিকিম আটপকা গণতন্ত্রের জন্য একেবারে পাগল হয়ে উঠবে—গণতন্ত্রের উপর অগাধ অনুরাগ সত্ত্বেও এমন ইতিহাস-ছাড়া কথা চট করে মেনে নেওয়া চলে না।

অগত্যা মেনে নিতেই হয় যে সিকিমের ভারতভুক্তির ব্যাপারটা ঘটেছে মূলত ভারতেরই গরজে। তাই.লেই প্রশ্ন ওঠে, এই গরজটা কোন জাতের, রাজনৈতিক না প্রশাসনিক ? এই প্রশ্নের জবাব দিল্লির কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। অতএব ধরে নেওয়া চলে যে দিল্লি হয়তো এক ঢিলে দুটো পাখীই মেরে দেবার চেষ্টা করে থাকবে। এই সংযুক্তির ফলে ভারতের যে কিছু কিছু প্রশাসনিক সুবিধে হয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। একোদর পৃথকগ্রীবা ত্রস্তে

৭

থাকাটা একদিকে যেমন কৌতুকপ্রদ, অপরদিকে তেমনই বিরক্তিকর। প্রস্তাব যাঁর, অনুমোদনও করবেন সেই তিনিই অথচ তার মধ্যেই হাজারো ফাইলের গোলক ধাঁধাঁ—পুট ফরওয়ার্ড কর আর রিমাইণ্ডার দাও। এছাড়া আরেকটা প্রশাসনিক যুক্তি থাকতে পারে—নিরাপত্তা ঘটিত। সিকিমের নিরাপত্তার দায়িত্বও সর্বতোভাবে ভারতের উপর বর্তিত রয়েছে। অতএব উভয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করবার জন্যই এমন বিস্ফোরক একটা কাজ না করে উপায় ছিল না—এমন যুক্তিও ধোপে টিকবে না। পুরানো চুক্তি অনুযায়ীই উভয়ের নিরাপত্তা বিধায়ে ভারত সেখানে প্রয়োজনীয় সব কিছুই করতে পারে—করে থাকে। এজন্য সিকিমকে ভারতভুক্ত করবার কোন প্রয়োজনই ছিল না—তবে একত্র হয়ে গেলে এক্ষেত্রেও ঝুট-ঝামেলা অনেক কমে যায়।

এই সংযুক্তির যদি কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে থাকে তবে তার ধরন-ধারণটাই বা কিরকম। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দুটো দিক আছে। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ। সিকিমের ভারত-ভুক্তির পরে মনে রাখবার মতো কোন আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। ঘটনাটা সবাই দেখেছে, কেউ মন্তব্য করেনি। তবুও এটুকু অনুমান করা শক্ত নয় যে এর ফলে (১) ভুটান একটু অস্বস্তির মধ্যে আছে, (২) বৈরী নাগা ও মিজোদের একগুঁয়েমি আরেকটু কঠোর হয়েছে, (৩) নেপাল নিশ্চয়ই আনন্দে আত্মহারা হয়নি (৪) চীন সম্ভবত একবার মুচকে হেসেছে, (৫) বাংলাদেশ ভ্রূকুঞ্চন করেছে এবং (৬) পাকিস্তান একবার গোঁফে তা দিয়েছে। সিকিমকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নিলে যে উল্লিখিত ঘটনাগুলো ঘটবেই তা যে কোন পাগলেও বলে দিতে পারত—দিল্লির আমলাদের তা অনধিগম্য থাকবার কথা নয়। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আন্তর্জাতিক এই লোকসানটুকু হবে জেনেই এই সংযুক্তির সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছে। কারণ তা সে যাই হোক, সেটি নিশ্চয়

এমনই অমোঘ ছিল যে তার পাশে এইসব স্থায়ী লোকসানগুলোও তুচ্ছ হয়ে গেছে।

এবারে দেখা যাক এই সংযুক্তির পিছনে ভারতের অভ্যন্তরীণ কোন রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল কি না। সেটি করতে হলে প্রথমেই ভারতের তৎসাময়িক রাজনৈতিক আবহাওয়াটা কেমন ছিল তার খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন। আবহাওয়া খুবই প্রতিকুল ছিল। ক্রান্তি-আন্দোলনে বিহার তখন সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড—উত্তর প্রদেশও বিক্ষিপ্তভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। কোন রাজ্যেই এতটুকু রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নেই—এমন কি নব-কংগ্রেসী রাজ্যগুলোতেও নয়। কারণে-অকারণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধছে, আইন ও শৃংখলা ভেঙে পড়ছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এখানে সেখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। উন্নয়নের কাজ সব থমকে আছে, দরিদ্ররা দিশেহারা, বল্গামুক্ত মুদ্রাস্ফীতি সম্পূর্ণ উদ্দাম। লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ সামরিক-বেসামরিক দেশের তাবৎ সরকারী কর্মচারীদের উপদেশ দিয়েছেন: বিবেকের সঙ্গে পরামর্শ না করে তাঁরা যেন কোন সরকারী নির্দেশও পালন না করে। এইসব এবং আরও অজস্র বিক্ষুব্ধকর ঘটনা তখন দেশের সর্বত্র প্রতিদিন ঘটেই চলেছে—মোগল আমলের শেষ অঙ্কে যেমন ঘটেছিল অনেকটা সেই রকম। এবারে আবার তৎসহ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত একরাশ দুরূহ ঝামেলা। দেশ তখন সত্যিই একটা আগ্নেয়গিরির শীর্ষদেশে অবস্থিত।

এমনতর অবস্থায় রাষ্ট্রনায়কেরা চিরকালই সর্বপ্রথম যা করে থাকে তা হল—খুবই চমকপ্রদ একটা কিছু ঘটিয়ে দিয়ে বিক্ষুব্ধ দেশবাসীর চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেওয়া। এ কাজ অম্লানবদনে সব দেশই করে থাকে—ঠগ খুঁজে লাভ নেই। সিকিমের ভারতভুক্তির নৈতিক বিচার অতএব আপাতত মুলতুবি থাক। অধিকতর প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হল: এর ফলে কি দেশবাসীর চোখ প্রত্যাশামত

বাঁধিয়ে ছিল-? স্মরণ হয় না। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটা যথোচিত গুরুত্বসহকারে সবকয়টি জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল—অগত্যা, মন্দ-কি ধরনের সম্পাদকীয়ও কিছু কিছু ছাপা হয়েছিল। কিন্তু এই নিয়ে শহরে শহরে মোর্চা গঠন করে একটা আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সেই সঙ্গে দেশবাসীর সুপ্ত জাতীয়তাবোধকে উদ্দীপিত করে তোলা—শাসকদল এসব কাজ আর করেই উঠতে পারল না ; হয়তো মাথায়ই আসেনি, হয়তো অধিকতর লাভজনক কোন কাজে ওঁরা ব্যস্ত ছিলেন। সে যাই হোক, সিকিমের ভারতভুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা ঘটে গেল অথচ অধিকাংশ ভারতবাসী সেই খবরটাই জানল না, যারা জানল তারা সেই মুহূর্তেই আবার তা ভুলে গেল।

কিন্তু কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ হোক আর না-ই হোক, সিকিমের ভারতভুক্তির ফলে নতুন কতগুলো সমস্যার সৃষ্টি হল—নানা জাতের নানা জটিলতার। এই সমস্যাগুলোর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য সাক্ষাৎভাবে জড়িয়ে আছে। কালক্রমে সারা দেশের ভাগ্য।

পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হয়ে মোরারজী দেশাই একবার বলে ফেলেছিলেন যে, কাজটা কোন দিক থেকেই সুবিধেজনক হয়নি, তবে এখন সবাই নাচার। এখন ভ্রম-স্বীকারের অবশ্যই কোন সার্থকতা নেই, কিন্তু অপকর্মটি এমনই ভয়াবহ যে দেশের প্রবীণতম পেশাদারী রাজনৈতিক নেতারও তা হজম হয়নি, সেজন্যই এর উল্লেখ, আর কাজটি যে কত বড় মূঢ়তা হয়েছে আস্তে আস্তে তার মালুম পাওয়া যাবে।

আগেই বলা হয়েছে, যে সিকিমের বর্তমান জনসংখ্যার শতকরা প্রায় আশী ভাগ নেপালী। প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের তিনটি সংলগ্ন মহকুমা দার্জিলিং, কার্সিয়াং ও কালিম্পঙের জনসংখ্যারও শতকরা প্রায় পঁচানব্বুই ভাগ নেপালী। পাশেই নেপাল। এই এলাকার ভাগ বাঁটোয়ারা ব্রিটিশরা যেমন করে গিয়েছিল এখনও

হুবহু তেমনই আছে, কিন্তু তবুও মনে রাখা দরকার, ভুলে গেলে ইতিহাস মনে করিয়ে দেবে, যে ব্যবস্থাটা ভিতর থেকে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠেনি, বাইরে থেকে আরোপ করা হয়েছে—এমন জিনিস বেশি দিন টিঁকে থাকে না। দিল্লি অথবা কলকাতার প্রতি এই এলাকার নেপালীদের আনুগত্য কতটা নির্ভরযোগ্য তাই নিয়ে প্রশ্ন তুললে বিতর্কের সৃষ্টি হবে, কিন্তু সাধারণভাবে এদের অনেকেই মহা-নেপাল আন্দোলনের সক্রিয় ও সোৎসাহী সমর্থক। সিকিমের ভারতভুক্তির ফলে আমাদের প্রশাসনের যতটা সুবিধা হয়েছে, মহা-নেপালের প্রবক্তাদের সুবিধা হয়েছে তার চাইতে অনেকগুণ বেশি। এই হ্যাপা ভারতকেই একদিন সামলাতে হবে।

আঘাতটা প্রথম এসে পড়বে পশ্চিমবঙ্গের মাথায়। দার্জিলিং, কার্সিয়াং ও কালিম্পং এই তিনটি মহকুমা ও তৎসহ তরাই অঞ্চলের কিছু কিছু এলাকা নিয়ে পৃথক একটা পার্বত্য জেলা গঠনের দাবী স্বাধীনতার পর থেকেই মাঝে মাঝে উচ্চারিত হয়ে আসছে। উগ্রতর নেপালী ভাষা আন্দোলনের পাশে পার্বত্য জেলার দাবীটা বর্তমানে নিরীহ হয়ে আছে ; ভাষার ব্যাপারটা একটু স্তিমিত হলে এই দাবীটাও তৎক্ষণাৎ জোরদার হয়ে উঠবে। ধরে নেওয়া যাক, আমাদের আমলাতন্ত্র অপর দশটা সমস্যার যেমনধারা মোকাবিলা করে থাকে এক্ষেত্রেও তার তেমন কিছু হের-ফের ঘটবে না। তাহলে, প্রথম দিকে, দাবীটাকে উপেক্ষা করা হবে। আন্দোলন একটু জমে উঠলে বলা হবে, কতিপয় বিচ্ছিন্নতাকামীর ছেলেমানুষী। অতঃপর আইন ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হলে তখন এই আন্দোলনের পিছনে বিদেশী ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হবে। ওদিকে দাবীটিরও মাত্রা চড়তে থাকবে—পৃথক জেলা ছাপিয়ে তখন দাবী উঠবে পৃথক রাজ্যের। নিদেনপক্ষে, মহকুমা তিনটিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেটে নিয়ে সিকিমের সঙ্গে জুড়ে দাও—সিকিম তো এখন ভারতেরই

অঙ্গরাজ্য—ভাষাগত কারণে সম্পূর্ণ সংবিধানসম্মত দাবী। কিন্তু প্রতিরক্ষার দিক থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকায় পৃথক একটি রাজ্য গড়ে তোলা হলে একটা বহুমুখী ঝুঁকি নেওয়া হবে। অতএব কেন্দ্রীয় পুলিশকে ডাকা হবে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য, যথাসময়ে সামরিক বাহিনী আসবে। তারপরই শুরু হবে অখণ্ড কানামাছি খেলা, কখনো উৎপীড়ন কখনো উৎকোচ। প্রতিবেশী আসাম রাজ্যে গত তেত্রিশ বছরে এই একই চিত্রনাট্য অবলম্বন করে কতবার কত ঘটনা ঘটে গেল। এ-ব্যাপারে আমাদের আমলাতন্ত্র প্রভূত পরিমাণ অভিজ্ঞতার দাবী রাখে।

সিকিমে সিকিমবাসীদের সঙ্গে ভারতীয় সমতলবাসীদের সম্পর্ক যে ঠিক সৌহার্দ্যপূর্ণ নয় সেকথাটা মনে রাখা নিরাপদ হবে। উভয়ে পৃথক পৃথক থাকে, পরস্পরের মধ্যে মেলামেশার কোন সুযোগই নেই। দুটি সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করছে অথচ তাদের মধ্যে নিতান্ত বিষয়কর্মটুকু ছাড়া অন্য কোনরকম যোগাযোগ নেই—ভারতে যেমন হিন্দু মুসলমান—এমন অবস্থায় মধ্যবর্তী শূন্যতাটুকু তিক্ততা ও বিদ্বেষে ভরে উঠতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য তিনটি মহকুমায় এই তিক্ততা বিদ্বেষ যে কতদূর গড়িয়েছে তা যাঁরা ওই এলাকায় প্রমোদ ভ্রমণে যান তাঁদেরও অগোচর থাকে না। ভাষা-আন্দোলনের নামে যতকিছু মারধোর হয় তার সবকিছুই ভাষাগত কারণে নয়। এই তিক্ততা ও বিদ্বেষের জন্য কোন পক্ষ কতটা দোষী তার দায়ভাগ করেও যাওয়া নিরাপদ হবে না। তবে উভয় পক্ষেরই কমবেশি দোষ আছে--গত তিরিশ বছরে আমরা কেউই এ-বিষয়টা খতিয়ে দেখিনি। একে অপরকে দোষী বলেছি এবং তার ফলে তিক্ততা আর বিদ্বেষটাই কেবল আরও উত্তপ্ত হয়েছে। এই উত্তাপের সঙ্গে এবারে যুক্ত হবে সিকিমের উত্তাপ। সিকিমের ভারতভুক্তির পর পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য এলাকার রাজনীতি একটা নতুন মোড় নেবেই— এবং তা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে

উদ্বেগজনক হতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গের দিক থেকে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হল পশ্চিমবঙ্গবাসীর মতামত ছাড়াই। এ ধরণের ঘটনা অবশ্য এইই প্রথম নয়।

সে যাইহোক, এবারে আবার নির্বাচনোত্তর সিকিমে ফিরে আসা যাক। সিকিমের বর্তমান শাসকদল ভারতভুক্তির ব্যাপারটা এখনও মনে-প্রাণে মেনে নেয়নি। যাঁকে ভরসা করে ব্যাপারটি সংঘটিত হয়েছিল সেই কাজী লেনডুপ দোরজি পরাভূত হয়ে আবার কালিম্পঙে ফিরে এসেছেন। অতঃ কিম্?

সমস্যাটা মুখ্যত দিল্লির। কাজী সাহেব মঞ্চে উপস্থিত নেই, অতএব দল ভাঙিয়ে সরকার ইধার-উধার করে দেওয়ার কথাই ওঠে না। সামনে মাত্রই দুটো পথ। এক, নব নির্বাচিত নেতাদের পোষ মানানো। দুই, ওদেরকে হেনস্থা করে তুলে জনসাধারণকে এদের সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তোলা। দিল্লি হয়তো দুটো পথই পরখ করে দেখবে - প্রথমটা সফল না হলে দ্বিতীয়টা। তবে এই দুটোর কোনটাই সমস্যা সমাধানের পথ নয় বরং আরো ঘোঁট পাকাবার পথ। যদি এই নব-নির্বাচিত নেতারা দিল্লির পোষ্য হন তবে পরবর্তী নির্বাচনে এঁরাও প্রত্যাখ্যাত হবেন। দৃষ্টান্ত: কাজী সাহেব। অপরদিকে, এঁদের যদি হেনস্থা-করা হয় তবে যে এঁরা বা এঁদের সাঙ্গপাঙ্গরা—কোন পথ নেবেন তা শয়তানেও জানে না। উত্তর পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যে এ-ব্যাপারে যে নজির রয়েছে তা এক কথায় ভয়াবহ।

সিকিম সম্পর্কে ইন্দিরা কংগ্রেসের কোন সুবিবেচিত পলিসি বা নীতি আছে বলে আমাদের জানা নেই, না থাকাই সম্ভব। আসাম বা মেঘালয় নিয়েই দিল্লি এখনো পর্যন্ত কোন নীতি স্থির করে উঠতে পারছে না, সিকিম তো সেদিক থেকে শান্তির এলাকা। কিন্তু সিকিমেও শান্তি একবার ভাঙলে তারপরে আর তা সহজে জোড়া লাগবে না। আইন ও শৃংঙ্খলার প্রশ্নটা যতই জরুরী হোক

না কেন, আসাম ও মেঘালয়ের মৌলিক সমস্যাটা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক। সিকিমেরও তাই,—এবং সিকিমের আইন ও শৃঙ্খলা এখনো পর্যন্ত অটুট আছে।

সিকিমের মৌলিক সমস্যাগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবার এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এইটেই শেষ প্রহর। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর আমরা বৃথা কালহরণ করেছি, তার মূল্য একদিন সুদেমূলে আমাদের শোধ করতেই হবে। এখন থেকেই আমাদের সেজন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার। এ-ব্যাপারে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি অগ্রণী হয়ে দেশবাসীকে এই সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করবে, সচেতন করে তুলবে এমন আশা করা বাতুলতা হবে - এবা বরং এর থেকে রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করবে, সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তুলবে। অবশেষে যখন কাটাকাটি শুরু হবে তখন একে অন্যের উপর দোষারোপ করবে। দিল্লি সাধু সাজবে। আর এই কাটাকাটির কোপটা যাদের উপর এসে পড়বে তাদের এখন অসহায়-ভাবে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই।

এই নাটকীয় অসহায়তা দিয়ে লেখাটি শেষ করব ভাবছিলাম, এমন সময়—খবর এল যে সিকিমের শাসক দল, বিরোধী দল ও বিলুপ্ত দল, যথাক্রমে সিকিম জনতা পরিষদ দল, সিকিম বিদ্রোহী কংগ্রেস দল এবং জনতা দল— সবাই নাকি যুগপৎ ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য লাইন দিয়েছে। খবরটি অসমর্থিত হলেও অবিশ্বাস্য নয়। দিল্লির শাসক দলের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সিকিমে রাজত্ব চালানো যায় না—এই আনুগত্যের পেছনে আছে আত্মরক্ষার তাগিদ। তা হোক, তোষামদে কে না খুশী হয়? দিল্লির খুশী হবার অন্য কারণও রয়েছে। তিনটি দলই যখন কৃপাপ্রার্থী তখন এদের একটিকে অপরের পিছনে লাগিয়ে দিয়ে তিনটি দলকেই পর্যুদস্ত করে দেওয়া শক্ত হবে না। তার মানে, সিকিমের এবং তৎসংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাটি আবার প্রথম বৃত্তে ফিরে আসবে। আবারও এক বা

একাধিক নেতা দিল্লির প্রিয়ভাজন হবে এবং সিকিমবাসীদের থেকে দূরে সরে আসবে—কাজী লেনডুপ দোরজির পদাঙ্ক অনুসরণ করলেই হল। আবারও উগ্রতর কোন স্লোগান মুখে নিয়ে নতুন কোন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটবে, ভোটে জিতবে, ইতিহাস মাঝে মাঝে বড় একঘেয়ে হয়ে পড়ে।

কিন্তু সকলেরই মনে রাখা দরকার যে ইতিহাস মাঝে মাঝে বিশ্রীরকম বাঁকও নেয়—উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যে ইতিমধ্যেই যেমন নিয়েছে—এবং তখন আর তাগা বাঁধবার জায়গা মেলে না।

অত্যল্পকালের জন্য ক্ষমতাসীন হবার অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীমোরারজী দেশাই নাগাল্যাণ্ড সমস্যা সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত তথা সংকল্পের কথা বেশ স্পষ্ট ভাষায় সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এ ধরণের নীতিগত প্রশ্নেও তিনি সাধারণত রূঢ় ভাষাই ব্যবহার করে থাকেন, এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। উত্তর, দক্ষিণ অথবা পশ্চিম অঞ্চলের কথা জানিনা, কিন্তু পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি বহুল-প্রচারিত সংবাদপত্র সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রধানমন্ত্রীর এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাকে কুণ্ঠাহীন অভিনন্দন জানিয়েছিল। আত্ম-গোপনকারী বিদ্রোহী নাগাদের মধ্যে এই রূঢ় ঘোষণা কতটা ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল তা এই মুহূর্তে জানা যায়নি।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় কোথায়ও এতটুকু অস্পষ্টতা নেই। নূতনত্বও সামান্য। তিনি বলেছেন, আত্মগোপনকারী নাগাদের সর্বাগ্রে আত্মসমর্পন করে ভারতের সংবিধান সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে হবে—তারপরে আলাপ আলোচনা। বিকল্পেঃ আত্মগোপনকারীদের কোতল (অ্যানাইহিলেট) করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর এই ঐতিহাসিক ঘোষণাটির মধ্যে যে স্ব-বিরোধিতা আছে আমরা এই মুহূর্তে সেই প্রসঙ্গে যাব না। বিদ্রোহী নাগারা যদি আত্মসমর্পনই করল, সংবিধানটাই পুরোপুরি মেনে নিল, তবে আর আলাপ আলোচনার রইলটা কি ? - এই প্রশ্নটাও আপাতত স্থগিত থাক। এসব কুটতর্কের আগে বরং একটু তলিয়ে দেখা যাক যে জনতা সরকারের এই নতুন সংকল্পটি কার্যকর করা সম্ভব কি-না ; এবং সংকল্পটি কার্যকর হলেই নাগাল্যাণ্ড সমস্যার সমাধান হবে কি না।

তারও আগে আমাদের স্পষ্ট করে জানা প্রয়োজন যে, সমস্যাটি

ঠিক কি ধরনের। এর গভীরতা এবং ব্যাপকতা কতটুকু? এই সম্পর্কে আমলাদের তৈরী ভারত সরকারের বক্তব্য মাঝে মাঝেই আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে ছাপান হয়ে থাকে। এই বক্তব্যের মধ্যে আপাত নজরে কোন জটিলতা বা অস্পষ্টতা চোখে পড়ে না। অতি অল্প সংখ্যক কিছু নাগা প্রথমটায় ইউরোপীয় মিশনারীদের ও তারপর অবলীলাক্রমে কম্যুনিস্ট চীনের ফুসলানিতে আত্মবিস্মৃত হয়ে ভারত রাষ্ট্রের বাইরে পৃথক একটি রাষ্ট্র গড়তে চাইছে। সব রকম প্রাকৃতিক সম্পদে বঞ্চিত এবং সবরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগে পর্যুদস্ত ছোট্ট একটু নাগাল্যাণ্ডের পক্ষে—ভারত থেকে ভরতুকি না জোগালে যার প্রশাসন চলে না, তার পক্ষে পৃথক হয়ে যাওয়া যে নিজেরই সর্বনাশ করা বিদেশী নেশায় এই সহজ যুক্তিটাও এদের মাথায় ঢোকে না। তবে এরা সংখ্যায় নেহাতই নগন্য—অদূর ভবিষ্যতেই সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যাবে। আর নাগাল্যাণ্ডের আপামর জন-সাধারণ সেই গোড়া থেকেই ভারতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, ভারতীয় সংবিধানের ছত্রছায়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ দিনযাপনের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। কখনো একটু ভিন্ন ঠাটে, কখনো একটু ভিন্ন ভাষায় এই একই ভিয়াবের বক্তব্য গত ত্রিশ বছরে অন্তত ত্রিশ হাজার বার ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পরিবেশিত হয়েছে। আমরা প্রায় সকলেই তা অলস চোখে পড়েছি এবং পড়তে পড়তেই ভুলে গেছি—নির্দ্বিধায় এবং বেমালুম।

অপরদিকে বিদ্রোহী নাগাদের বক্তব্য সম্পর্কে আমাদের প্রায় কিছুই জানা নেই—আমরা যে জানি-না তাও জানা নেই। এ সম্পর্কে সাংবাদিকেরা কখনো রিপোর্ট করেনি, সংবাদপত্রে কোন রিপোর্ট ছাপা হয়নি। অযৌক্তিক অথবা হাস্যকর হোক, বিদ্রোহী নাগাদেরও যে একটা বক্তব্য থাকতে পারে, থাকা সম্ভব, এই সম্ভাবনাটিকেই আমরা সবাই এতকাল হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়েছি। মাঝে মাঝে বা সুযোগমত বিদ্রোহী নাগাদের কিছু

অশালীন উক্তি, অসঙ্গত আচরণ, ও অভব্য কীর্তি-কলাপের কথা কাগজ-পত্রে বেশ ফলাও করে ছাপা হয়েছে। প্রসঙ্গ ও পশ্চাৎপট থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই সব উক্তি, আচরণ ও কীর্তিকলাপের কথা পড়ে পাঠক কখনো পবিত্র বিতৃষ্ণায় কণ্টকিত হয়েছে, কখনো হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরিয়েছে। কিন্তু বিদ্রোহী নাগাদের প্রকৃত বক্তব্যটা কি, ওরা কেন—কিসের দায়ে অথবা কিসের জোরে —সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে এমন রক্তক্ষয়ী, এমন অসম্ভব একটা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তা সহজভাবে আজ পর্যন্ত দেশবাসীকে জানান হয়নি। এ-সম্পর্কে দেশবাসীর কৌতূহলকেও নেশাগ্রস্ত করে রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে ঘড়ি ধরে কেবল নৌতাতটুকু ধরিয়ে দেওয়া: ব্যাটারা বড় বদমাইশ, এবারে শায়েস্তা হবে। ব্যস, এই করে পুরো ত্রিশ বছর কেটে গেছে এবং এখনো নতুন করে আবার ব্যাটাদের শায়েস্তা করবই—একেবারে ঝাড়েবংশে।

টানা ত্রিশ বছরের পর্যায়ক্রমিক সংঘর্ষ ও সম্প্রীতির ফলে সমস্যাটি যে আজ অনেক বেশী জটিল এবং বিরোধটা অনেক বেশী তিক্ত তা সহজেই অনুমান করা যায়। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে সযত্নে লালিত-পালিত হলে হিংস্রতম সমস্যারও একটা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সত্তা দাঁড়িয়ে যায়। এর আশ্রয়ে অজস্র রকমের কায়েমী স্বার্থ গজিয়ে ওঠে শিকড় ছড়িয়ে আঁকরে ধরে। সমস্যাটির তাতে জটিলতা বৃদ্ধি পায়, আয়ুও বেড়ে যয়ে। আমাদের নাগাল্যাণ্ড সমস্যার যৌবনচিত সজীবতা সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে কেবল যে অটুট থেকেছে তাই নয়, তার দাপটে দিনকে দিন অধিকতর স্পর্ধাপূর্ণ হয়ে উঠছে। এমতাবস্থায় এর আয়ু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করতে স্বয়ং চিত্রগুপ্তও দ্বিধা বোধ করবে। প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই অবশ্য ভিন্ন ধাতুতে গড়া।

তবে যতই জটিল এবং দুরপনেয় হোক, এই সমস্যাটির সঙ্গে আমাদের দেশের ভবিষ্যতটাও জড়িত, অনেকটা ভিয়েটনামের সঙ্গে

আমেরিকার যেমন ছিল। এই সমস্যাটিকে আমরা গত ত্রিশ বছর আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু সমস্যাটির তীব্রতা তাতে বেড়েছে বই কমেনি। আমাদের অবহেলার সুযোগ নিয়ে সমস্যাটি বরং আরও শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে।

ভারতবর্ষ ও নাগাল্যাণ্ডের মধ্যেকার এই বিরোধটি ব্রিটিশ আমলেই রোপিত হয়েছিল। এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের অল্প পরেই আমাদের আমলাতন্ত্রের সুদূরপ্রসারী বিচক্ষনতায় তাতে ফল ধরতে শুরু করে। এই ভূখণ্ডে ব্রিটিশদের প্রয়োজন অত্যন্ত সীমিত ছিল। এই দুর্ধর্ষ জায়গার একদিকে ভারতবর্ষ আর অপরদিকে ব্রহ্মদেশ উভয়তই ব্রিটিশ উপনিবেশ। আর অনেক জঙ্গল পেরিয়ে সুদূর চীন তখন নিজের মাথার ঘায়েই পাগল। তাছাড়া কোনরকম বানিজ্যিক বাধ্যবাধকতাও অনুপস্থিত। ব্রিটিশরা নিজেদের প্রয়োজনের সীমা জানত এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের নীতিনির্ধারণ করত। প্রয়োজন ছিল না বলেই নাগাদের ওরা একদমই ঘাঁটায় নি। ঘাঁটিয়ে ঘোঁট পাকায়নি। বিচ্ছিন্ন কোন নাগাগোষ্ঠী হঠাৎ করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ঢুকে পড়ে যাতে ব্রিটিশদের বিষয়কর্মে কোনরকম ব্যাঘাত না ঘটায় কেবল সেদিকে নজর রাখা। ব্রিটিশদের অধীনে থেকেও নাগা-সমাজ তাই ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের ছোঁয়ায় জাতিচ্যুত হয়নি। মিশনারিরা এখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগামী দল হিসাবে আসেনি, শোষণযন্ত্র বসাবার স্থান নির্বাচন করতে আসেনি। নাগারা ওদের শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে, এবং হয়তো সেই জোরেই ওরাও নাগাল্যাণ্ডে শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধেয়ই থেকে গেছে। প্রকৃত শ্রদ্ধা আজও অপরপক্ষ থেকে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

নাগাদের সঙ্গে ব্রিটিশদের প্রথম অন্তরঙ্গ পরিচয় হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। জাপানী সেনারা তখন কোহিমা প্রায় দখল করে বসেছে। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে নাগাল্যাণ্ডে জাপানীরা

ঠিক মুক্তি-বাহিনীর মতো আপ্যায়িত হয়নি। নিজেদের সীমাবদ্ধ প্রয়োজন অনুসারে নাগারা তখন একরকম স্বাধীনই ছিল। জাপানী অনুপ্রবেশের ফলে ওদের সমাজ জীবন বরং এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। অন্য দশটা পাহাড়ী উপজাতির মতো নাগাদেরও স্বাধীনতা-স্পৃহা অত্যন্ত টনটনে এবং তার উপরে দুরমুস চালিয়েই জাপানীরা কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। নাগাদের সামাজিক ইতিহাসে সেইটে একটা চরম মুহূর্ত।

ওদিকে ব্রিটিশদেরও তখন চূড়ান্ত অবস্থা! কোহিমা ছাড়িয়ে গড়াতে শুরু করলেই জাপানীরা সোজা ব্রিটিশের খাস-তালুক আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এসে পৌঁছবে। ব্রিটিশরাও মাটি কামড়ে লড়ছিল। এই চরম বিপদের দিনে, একই সঙ্গে একই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবার ফাঁকে ফাঁকে ব্রিটিশদের সঙ্গে নাগাদের প্রথম সখ্যতা হয়। বিপদের দিনের সখ্যতা সাধারণত স্থায়ী হয়। হয়ত এক্ষেত্রেও হত, কিন্তু এর অল্পদিন পরেই ব্রিটিশদের এই উপ-মহাদেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়। যাবার আগে ব্রিটিশরা নিশ্চয়ই নাগাদের কানে আমাদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে খুব ভাল কিছু বলে যায়নি। ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের তৎকালীন তিরিক্ষে মেজাজের কথা স্মরণ করলে বরং তার বিপরীতটা ঘটে থাকবারই সম্ভাবনা বেশি।

তাছাড়া, পাহাড়ী উপজাতিদের সঙ্গে সমতলবাসীদের একটা সহজাত বিরোধ আছে—কেবল ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই পাহাড়ের অধিবাসীরা সমতলবাসীকে সন্দেহের চোখে দেখে থাকে। এই অবিশ্বাসের যুক্তিসঙ্গত কারণও নিশ্চয়ই আছে। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে নাগাদের সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল এমন একটা কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়, কিন্তু তার পক্ষে কোন ইতিহাস-গ্রাহ্য সাক্ষ্য নেই। সীমান্ত এলাকার হাটে-বাজারে উভয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই দেখা সাক্ষাৎ

হত, দর কষাকষিও হত, এবং তার ফলে সহজাত বৈরীভাবটা দূরীভূত হবার পরিবর্তে হয়তো আরো ঘনীভূত হয়ে থাকবে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশরা এসে নাগাল্যাণ্ডকে ভারতবর্ষ থেকে আরও অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সমতলের জাতীয়তাবাদী সংক্রামক ব্যাধিটি যাতে সহজ সরল পাহাড়ী উপজাতিদের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়তে পারে, সেদিকে ব্রিটিশদের খুব সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্যই ব্রিটিশরা কেবল অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ও বারুদস্তুপের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত দেয়নি—সেই ব্যবধানটুকুকে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস, এমনকি আক্রোশ দিয়ে ভরাট করে সম্পূর্ণ অনতিক্রম্য করে রেখেছে। চলে যাবার আগে ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরা এই প্রতিবন্ধকতাগুলি সৌজন্যের সঙ্গে অপসৃত করে যাননি; বরং শেষ বিদায়ের আগে হতাশার র‍্যাঁদায় সেগুলোকে আরও ঝক্ঝকে সূঁচলো করে দিয়ে থাকবেন।

অতএব ভারতের স্বাধীনতা দিবসে নাগারা যদি তেমন করে রোমাঞ্চিত না হয়ে থাকে, তবে তাতে ব্যথিত হবার কারণ থাকলেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। ব্যাপারটা আমাদের চোখে খুবই বিসদৃশ, ততোধিক বে-আইনী, এবং তার চাইতেও বেশি দেশদ্রোহিতা-মূলক মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে ব্রিটিশরা কখনোই নাগাল্যাণ্ডের দখল নেয়নি; ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি রুই-কাৎলার সঙ্গে অন্য দশটা চুনোপুঁটির মতো উঠে এসেছিল নাগা অধ্যুষিত খানিকটা এলাকা; সেই সূত্রেই দখলী স্বত্ব। কিন্তু এই স্বত্ব ওরা পেয়াদা পাঠিয়ে কখনো জাহির করবার চেষ্টা করেনি। সামান্য কয়েকটা ফাইল আসাম প্রদেশের সিভিলিয়ানরাই নাড়াচাড়া করত এবং সেই সূত্রেই আসামের মানচিত্রে নাগা এলাকার অন্তর্ভুক্তি। ব্রিটিশরা কখনো এমনকি সভ্যতার আলোক-বর্তিকা নিয়েও নাগা সমাজে প্রবেশের চেষ্টা করেনি, তার কোন বাণিজ্যিক

প্রয়োজন ছিল না, আর তাছাড়া আগুন যতদিন সুপ্ত থাকে ততদিনই মঙ্গল।

নাকে অচেনা গন্ধ ঢুকলেই বন্যপ্রাণীরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এই শঙ্কা থেকেই কালক্রমে বেপরোয়াভাবের জন্ম হয়, কিন্তু সেকথা পরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই যখন হুড়মুড় করে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা উঠল, নাগারা তখন নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ব্রিটিশদের কাছ থেকে কথা আদায় করল যে নাগাদের ব্যাপারটা বিশেষভাবে ও পৃথকভাবে বিবেচনা করা হবে। ব্রিটিশদের ক্ষেত্রে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব হতো কি না ইতিহাস তা যাচাই করে দেখবার সময় দেয়নি।

অতঃপর দেশবিভাগের মজাটা যখন খুব জমে উঠল নাগারা তখন দিশেহারা হয়ে মহাত্মা গান্ধীর শরণ নিল। মহাত্মাজী নাকি নাগাদের কথা দিয়েছিলেন যে নাগাবা যদি সত্যিই ভারতবর্ষের বাইরে থাকতে চায় তবে অবশ্যই তাদের ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। মহাত্মাজী সত্যিই নাগাদের এমন কথা দিয়েছিলেন কি না আমাদের তা সঠিকরূপে জানা নেই—ত্রিশ বছরের ব্যবধানে আজ তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। কিন্তু এই ব্যাপারটি আমরা স্বেচ্ছায় বা স্বাভাবিকভাবে ভুলে গেলেও নাগারা কিন্তু ভোলেনি। ওরা বলে, ক্ষতের জ্বালা চেষ্টা করেও ভোলা যায় না। বিশেষ করে ক্ষতটা যখন দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমরা বলি, এই সবই বৈরী নাগাদের নষ্টামি।

তারপরে মহাত্মাজী খুন হলেন। ভারতের সংবিধান রচিত হল। কেবল পাকিস্তান ও পূর্ব-পাকিস্তান রফা অনুযায়ী বাদ দিয়ে ব্রিটিশ ভারতের সবটুকু এলাকা ভারত প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হল—নাগা এলাকাটা হল আসাম রাজ্যের একটা জেলা। নাগারা সেদিন গির্জায় সমবেত হয়ে থাকবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত নাগাদের একটা গোষ্ঠী হিসাবেই উল্লেখ করা

হয়েছে। সেটা ঠিক নয়। নাগারা আসলে বহু গোষ্ঠী ও অন্তত চৌদ্দটি ভাষা-উপভাষায় বিভক্ত। এই গোষ্ঠিগুলোর মধ্যে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এই ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত আত্মযুদ্ধও চলে আসছে অব্যাহত গতিতে—অন্য দশটা প্রাগৈতিহাসিক ঐতিহ্যের মতোই। নিজেদের গায়ে আঁচ না লাগলে ব্রিটিশরা কখনো এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনি। স্বয়ং যীশুও নাগাদের এই ঐতিহ্যময় অন্তর্যুদ্ধ থামাবার জন্য সক্রিয় কোন চেষ্টা করেননি। সব গোষ্ঠীরই কিছু কিছু লোক তাঁকে পৃথক পৃথক ভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তি করেছে এবং তিনি তাইতেই তুষ্ট থেকেছেন—এবং ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে এই পৃথক পৃথক লেনদেনের ব্যাপারটা ব্রিটিশ প্রভুদেরও সুন্দর কাজে লাগত। কার মনের ভিতর কখন কি ঘটছে, বা ঘটতে পারে, ঠিক সময়ে তা সঠিকরূপে জানতে পারলে সাম্রাজ্য চালাবার জন্য আর পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজন হয় না। এদিক থেকেও নাগারা মনে প্রাণে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বাইরেই থেকে গেছে। জাপানীদের কঠোররূপে সুশৃঙ্খল শাসনাধীনে আরও কিছুকাল থাকবার সুযোগ ঘটলে নাগারা হয়তো ঐক্যবদ্ধ হতে পারত। সেই অস্থায়ী ঝড় কেবল একটা অস্থায়ী ঐক্যেরই কারণ হয়েছিল—সংজ্ঞানুযায়ী যেমন হওয়া অনিবার্য।

এই বৃত্তান্ত থেকে এমন ধারণা করা ভুল হবে যে ভারতে ব্রিটিশদের শেষ দিনটি পর্যন্ত নাগারা সম্পূর্ণরূপে অরণ্য-জগতের মানুষ ছিল—যেই ভুল গত ত্রিশ বছর ধরে আমরা করে আসছি এবং সেই ভুলটা এতদিনে আমাদের অনেকেরই প্রায় স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। ওরা ওদের প্রিমিটিভ বাসায় যূথবদ্ধ হয়ে থাকে, আনন্দোৎসবে ঘটা করে কুকুরের মাংস রাঁধে—কিন্তু ওদের সমাজ-জীবনে যে সুশৃঙ্খলা এই সেদিন পর্যন্ত বজায় ছিল আর্যাবর্তে আমরা তা অনেককাল আগেই হারিয়েছি, কোনকালে ছিল বলেই ভুলে গেছি। এদের প্রাচুর্য ছিল না কিন্তু অভাবটা সমানভাবে বণ্টিত

ছিল। আমরা যাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ইত্যাদি বলি তা এদের মধ্যে ছিল না, কিন্তু সামাজিক ঐতিহ্য অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব বিকাশের সব রকম সুযোগ ছিল। বিবর্তনের একটা স্তরে পৌঁছে নাগা-সমাজ ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেয়নি, সভ্যতার দিশেহারা চৌমাথা থেকে অনেক দূরে নিজেদের বিবর্তনের পথ ধরে ওরা পায়ে পায়ে অগ্রসর হচ্ছিল—সজীব, সুশৃঙ্খল, সতর্ক পদক্ষেপে। এমনকি যীশুকেও ওরা গির্জায় গিয়ে শ্রদ্ধাভক্তি জানিয়ে এসেছে—সমাজের দাওয়ায় ডেকে বসায়নি। ব্যক্তিগত দুঃসাহসিকতার জন্য ব্রিটিশ তথা ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে নাগারা যেসব মেডেল নিয়ে এসেছে তা গ্রামের সভাগৃহের দেওয়াল অলঙ্কৃত করেছে। নাগারা কেবল নিজেদের সামলাবার কাজটি ছাড়া অন্য কোন কাজে কোনও দিন পিছিয়ে এসেছে একথা ভারতের কোন প্রধানমন্ত্রীও কোন দিন বলতে পারেননি। কিন্তু নাগারা ঐক্যবদ্ধ ছিল না—ইতিহাস তখনো পর্যন্ত নাগাদের ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ দেয়নি।

সেই সুযোগ এল দুর্যোগের আকার ধরে। দিল্লিতে এবং লণ্ডনে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারটা কোহিমা থেকে যদি দুর্যোগের ঘনঘটা বলে মনে হয়ে থাকে তবে তা অসংগত হয়ে থাকতে পারে, নাগাদের দিক থেকে কিন্তু অযৌক্তিক হয়নি, খতিয়ে দেখলে সেই মুহূর্তে এই ভয়টা হয়তো অমূলক ছিল—সিঁদুরে মেঘ দেখেই ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেওয়াটা হয়তো ঠিক হয়নি। কিন্তু সংবিধান রচনার সময় নাগা মতামত এখন তুচ্ছতার সঙ্গে উপেক্ষিত হয়েছে যে তারপরেও আশ্বস্ত থাকাটা বিপজ্জনক হবে বলে নাগাদের মনে হয়ে থাকতে পারে; তাছাড়া নাগারা এতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছে।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে অজস্র পার্বত্য উপজাতি আছে। ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক কারণে এরা সবাই একই বিবর্তনের পথ ধরে অগ্রসর হয়নি; কেউ একটু ধীরে চলেছে, কেউ একটু দ্রুত; কারো উপরে সমতলের প্রভাব একটু বেশি পড়েছে, কারো উপরে কম; কেউ

হয়তো একটু বেশি স্পর্শকাতর, কেউ একটু বেশি সন্দেহপ্রবণ; কারো ক্ষেত্রে আত্ম-সম্মান বোধ একটু থতমত খেয়ে আছে, কারো ক্ষেত্রে তা খুব উগ্র: অপমানিত হলে কেউ ঘরে বসে কাকিয়াদ টানে, কেউ দক্ষযজ্ঞ বাঁধায়। কিন্তু এই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রভেদ দিল্লির দূরত্ব থেকে চোখে পড়বার কথা নয়। সংবিধানে পূর্বাঞ্চলের যাবতীয় পার্বত্য উপজাতিদের জন্য—মুড়ি-মুড়কি নির্বিশেষে একটাই ব্যবস্থা-পত্র দেওয়া হল। ব্যবস্থা-পত্রে স্বাভাবতই রোগ নিরাময়ের চাইতে অনেক গুণ বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল সাময়িক যন্ত্রনা-উপসমের উপর।

সবাই মেনে নিয়েছে—কেনন', অমান্য করবার শক্তি-সামর্থ্য নেই—কিন্তু এই ব্যবস্থা-পত্র পূর্বাঞ্চলের কোন উপজাতি গোষ্ঠীই কোনদিন অন্তর থেকে গ্রহণ করেনি, একদিনের জন্যও নয়। এই ব্যবস্থা-পত্রের পর নাগা গোষ্ঠীগুলো অস্ত্রযুদ্ধ শিকেয় তুলে আস্তে আস্তে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করল। অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হলে বনের পশুরাও যেমন করে একত্রিত হয়। একাজে যীশুও সহায় হলেন।

ভারতীয় সেনা বাহিনীর সঙ্গে নাগাদের অঘোষিত যুদ্ধ ঠিক কবে শুরু হয় এবং কে প্রথম অস্ত্র নিক্ষেপ করে আজ আর তা সঠিকরূপে জানা সম্ভব নয়। তার কোন আশু প্রয়োজনও নেই। তবে এই দাহ্য অবস্থাটি সামলাবার প্রথম দায়িত্ব পড়েছিল আসাম রজ্যের উপর। দায়িত্বটি অন্য কোন রাজ্যের উপর পড়লেও একই শোচনীয় ঘটনা ঘটত—তার অজস্র নজির আছে। তবে এক্ষেত্রে যা ঘটল তাকে এককথায় বলে—কেলোর কীর্তি। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের যেমন একটি ধারা আছে তেমনি আমাদের আমলাতন্ত্রেরও একটি ধারা আছে—সমান অস্খালনীয়। এমনকি ফাইলগুলোও একটু বে-লাইনে চলে না। যেমন দিল্লিতে, যেমন কলকাতায়, তেমনি কোহিমায়।

ব্রিটিশরা চলে যেতে-না-যেতে ই বরাদ্দের টাকা নিয়ে সরকারের

ডিপার্টমেন্টগুলি একে একে নাগাল্যাণ্ডে হাজির হতে শুরু করল। সব জাতিরই, বিশেষত শহরাঞ্চলের কিছু লোক সব সময়ই টাকার বশ, ক্ষমতারও একটা আকর্ষণ আছে। গোড়ার দিকে ব্রিটিশরা যেমন বাংলাদেশে নিজেদের সাগরেদদের চিনে নিয়েছিল, আমাদের রাজনৈতিক নেতা ও আমলারা নাগা জেলায়ও নিজেদের সাগরেদদের চিনতে একটুও ভুল করেনি। নাগাদের ভালোর জন্যই গ্রামে গ্রামে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রসার করে দেবার ধুমধারাক্কা পড়ে গেল।

নাগারা বিশ্বাস করে, ঐতিহাসিক কালের মধ্যে নাগা সমাজ-ব্যবস্থার উপর এইটেই প্রথম বহিরাক্রমণ। ব্যাপারটা সত্য কি মিথ্যা তাই নিয়ে অনন্তকাল ধরে তর্ক চলতে পারে এবং চলবে। কিন্তু এই মুহূর্তে যা অধিকতর প্রাসঙ্গিক তা হল, নাগারা এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসটির উপর ভিত্তি করেই ভারতবর্ষীয় সবকিছুর প্রতি নাগা-সমাজের মনোভাবটি গঠিত। সেটি যে খুব একটা প্রীতিপূর্ণ নয় তা আজ সবাই জানে। এসব এলিমেন্ট-কে একটু সন্তর্পণে নাড়াচাড়া করতে হয়। ভারতের তরফে করা হল ঠিক তার উল্টোটি। জনকল্যাণকামী লটবহর নিয়ে প্রশাসন তো এলই, আর এল তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা বড় ব্যাওসায়ী, উদ্যমী ঠিকাদার আর কিছু নীতিবোধবর্জিত ভাগ্যান্বেষী। এদের সম্মিলিত তৎপরতায় শীঘ্রই খেলা জমে উঠল। সামরিক বাহিনী মঞ্চে প্রবেশ করল। সংবাদপত্রে নাগা নৃশংসতার বীভৎস সব বিবরণ ছাপা শুরু হল। ঘটনা নিজের গতিপথ ধরল।

আমাদের একটা জাতীয় অভ্যাস এই যে একটা মনোগ্রাহী অজুহাত পেলে আমরা সেইটেকেই সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নিই। নাগা সমস্যার সূত্রপাত হতেই সেটির পুরো দায়িত্ব ইউরোপীয় মিশনারিদের উপর নির্বিবাদে চাপিয়ে দেওয়া হল। নাগারা প্রায় সবাই মনেপ্রাণে দেশপ্রেমী—নাটের গুরু ওই ইউরোপীয় মিশনারিগুলো। এদের

অন্তর্ঘাতমূলক প্রভাব কাটিয়ে নাগাদের রক্ষা করবার কাজে হাত দিতেই নাগারা তা প্রতিরোধ করবার জন্য মরীয়া হল। কয়েক প্রস্থ সংঘর্ষের পর ইউরোপীয় মিশনারিরা দেশে ফিরে গেল। কিন্তু নাগাল্যাণ্ডে শান্তি এল না।

তখন শুরু হল আলাপ আলোচনা। দিল্লির কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও স্বয়ং নেহরু এ-ব্যাপারে ইনটারেস্ট নিলেন। সরকারী, আধা-সরকারী, ও বেসরকারী নানা পর্যায়ে পুনঃ পুনঃ, অজস্র পুনঃ, বৈঠক হতে থাকল। স্বয়ং নেহরু বারম্বার কোহিমায় দর্শন দিলেন। এই পর্বতপ্রমাণ প্রয়াস থেকে বেশ কিছু সংখ্যক জমকালো প্রস্তাব ভূমিষ্ঠ হয়—নেহরু প্ল্যান, স্কটিশ প্ল্যাটার্ন, শিলং অ্যাকর্ড আরও নানা চুক্তি, নানা বোঝাপড়া। কিন্তু পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত গভীর ও অত্যন্ত যুক্তিসংগত অবিশ্বাসের দরুণ এই সব চুক্তি কখনোই কার্যকর হতে পারত না। তথাপি, তথাভিজ্ঞ মহলে এই নিয়ে আজও তুমুল বাদ-বিতণ্ডা হয় যে কার দোষে কোন চুক্তিটি পরিত্যক্ত হয়েছে। আমরা ভারতীয়রা খুব ভালো করেই জানি – সব দোষ ওই নাগা ব্যাটাদের। নাগারা বলে ঠিক তার বিপরীত, এবং ওরা আরও যেসব নেপথ্য কাহিনী উদ্ঘাটন করে আজ পর্যন্ত অপর তরফ থেকে সে সবের কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবাদ হয়নি। এই সব মৃত-জাত প্রস্তাবের পোস্ট-মর্টেম করে নাগা প্রব্লেম সম্পর্কে চট করে স্পেশালিস্ট হওয়া যায় সে ছাড়া এসবের আজ আর কোন প্রাসংগিকতা নেই। অর্ধ-আন্তরিক ও ব্যর্থ প্রয়াস মাত্রেই পেছনে প্রচুর পরিমান তিক্ততা, হতাশা, অবিশ্বাস ইত্যাদি রেখে যায়। নাগা-সমস্যা এমনিতেই অত্যন্ত জটিল সমস্যা, সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের রেষারেষির ফলে আজ তা জটিলতর। পুঞ্জীভূত পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে সেটিকে আরও গেঁজিয়ে তোলবার কোন মানে হয় না।

মোদ্দা কথাটা এই যে গত ত্রিশ বছরে নাগা সমস্যাটি সমাধানের

দিকে ত্রিশ গজও অগ্রসর হয়নি, বরং ত্রিশ সহস্র মাইল দূরে সরে গেছে। অহিংস সহিংস সব রকম ব্যবস্থা-বিধি প্রয়োগ করা হয়েছে কিন্তু কোন ফল হয়নি। সামরিক পর্যায়ে, প্রশাসনিক পর্যায়ে এবং রাজনৈতিক পর্যায়ে বৈঠকের পর বৈঠক হয়েছে, কিন্তু সমাধানের কোন সূত্র বের হয়নি। চীন, মালয় এবং ভিয়েটনামে 'স ফল্যের" সঙ্গে প্রযুক্ত নানা রকমের অ্যান্টি-ইনসারজেনসি টেকনিক নাগাল্যাণ্ডেও প্রযুক্ত হয়েছে। গ্রাম-কে-গ্রাম উজাড় করে গ্রামবাসীদের "পুনর্গঠিত গ্রামে" এনে রাখা হয়েছে। দুষ্ট লোকেরা এই সব পুনর্গঠিত গ্রাম-কে কনসেনট্রেশন ক্যামপের সঙ্গে তুলনা করলে সরকারের তরফ থেকে তার রোষান্বিত প্রতিবাদ করা হয়েছে। নাগাদের জন্য জনে জনে ব্যক্তিগত পরিচয়-পত্র ইস্যু করা হয়েছে সামরিক বাহিনীর তরফ থেকে। নাবালকদের সামনে গুরুজনদের মার-ধর করা হয়েছে, পুত্রের সামনে পিতার, মাতার সামনে কন্যার এবং ভক্তবৃন্দের সামনে ধর্ম-যাজকদের অপমান করা হয়েছে। প্রতিটি পাহাড়ের চূড়োর দিকটা বুল-ডোজার দিয়ে দুরমুস করে সেখানে সামরিক আস্তানা গড়ে তোলা হয়েছে—যাতে প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি লোকের গতিবিধির উপর সব-সময় নজর রাখা যায়। এইসব অপারেশনের জন্য প্রচুর রাস্তাঘাটের প্রয়োজন হয় এবং নাগাল্যাণ্ডের শিরা-উপশিরায় সেইসব রাস্তাঘাট নির্মাণের বরাত দেওয়া হয়েছে বহিরাগত ভাগ্যান্বেষীদের উপর। নানা খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। কিন্তু নাগা সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। কোহিমার রাজপথে চলতে গেলে আজও প্রতি দশ জন পথচারীর মধ্যে সাত জনই আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর লোক।

আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলোও একইভাবে ব্যর্থ হয়েছে। নাগাল্যাণ্ডকে রাজ্য স্তরে তুলে দেওয়া হয়েছে, সেখানে মাঝে মাঝে নির্বাচন হয়, মন্ত্রীসভা গঠিত হয়—কিন্তু আর কিছু হয় না। এবারে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেন, পরের বারে তাঁরা খারিজ

হয়ে যান। নতুন যাঁরা আসেন তাঁরাও অচিরকালের মধ্যেই নাগা-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রশাসনের হাতের পুতুল হয়ে পড়েন। সমস্যাটি আরও শিকড় বিস্তার করে যেখানে ছিল সেখানেই অনমনীয় দাঁড়িয়ে থাকে।

এবারে দেখা দরকার যে লড়াইটার কেন এতদিনেও একটা নিষ্পত্তি হল না। সমস্যাটির সমাধান না হয় খুবই জটিল, কিন্তু একটা সামরিক অ্যাকশন, যার লক্ষ্য ও পথ সাধারণত পূর্ব-নির্ধারিত থাকে, সেই সামরিক অ্যাকশন কেন এতদিনেও সমাধা হল না? নাগাদের মোট জনসংখ্যা লাখ ছয়েক এবং তার মধ্যে আমাদের সামরিক বাহিনীর হিসাব অনুযায়ী, বিচ্ছিন্নতাকামী নাগার সংখ্যা কখনো দেড়'শ দু'শ, এবং কখনোই দু'তিন হাজারের বেশি নয়। এমন কি নাগা জনসংখ্যার সবাই যদি বৈরী হয়, তবুও ওই কয়টি তো মানুষ, তাদের তাঁবে আনতে বা ঠাণ্ডা করতে কতদিন সময় লাগা উচিত? তিন তিনটে দশক এর মধ্যে কেটে গেছে।

এমন কথা বলা চলবে না যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কাজ হাসিল করবার মতো যথেষ্ট সময় অথবা সুযোগ দেওয়া হয়নি। নাগাল্যাণ্ডে আজ পর্যন্ত উভয় পক্ষের কতজন করে নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন, বা সেখানে এ-পর্যন্ত ছোট-বড়-মাঝারি মিলিয়ে মোট কয়টি 'সংঘর্ষ' হয়েছে—এ সবের নির্ভরযোগ্য কোন হিসেব সংকলিত হয়েছে বলে আমি জানি না। আর কিছুদিনের মধ্যেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে বলে সময় নিতে নিতে পুরো ত্রিশ বছর কেটে গেছে এবং এখনো পথের শেষ দেখা যাচ্ছে না। ভারতের অন্যত্র পুলিশ দু'রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়লে বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়ে যায়; অথচ গত ত্রিশ বছর ধরে নাগাল্যাণ্ডে আমাদের সেনাবাহিনী কী ধরণের শান্তি প্রতিষ্ঠা করে চলেছে সে সম্পর্কে কোন বিভাগীয় তদন্তের রিপোর্টও ছাপা হয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। একটা সুসজ্জিত সেনাবাহিনী—যে বারম্বার পাকিস্তানকে

হারিয়েছে, লালচীনকে রুখেছে, আর তার প্রতিপক্ষে কতিপয় বিক্ষিপ্ত বৈরী নাগা। ত্রিশ বছরেও এর একটা নিষ্পত্তি হল না। কেন?

এখানে প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে দোষ একা সামরিক বাহিনীর নয়। তেমন সুস্পষ্ট নির্দেশ পেলে আমাদের সামরিক বাহিনী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নাগা-পাহাড়কে একেবারে সমতল-ভূমি করে দিতে পারে। সে হিম্মৎ তার আছে। কিন্তু তেমন সুস্পষ্ট সামরিক নির্দেশ দেবার রাজনৈতিক পরিমণ্ডল আজকের ভারতবর্ষে নেই। সম্প্রতি মোরারজী দেশাই অবশ্য বলেছেন যে প্রয়োজন হলে বৈরী-নাগাদের ঝাড়ে বংশে নিকেশ করে দেবেন। কথাটা নিষ্ঠুর হলেও, মনোভাবটা নিষ্ঠুরতর হলেও, এটাকে আমরা মুখের কথা বলে, একজন রাগী মানুষের উষ্মা-প্রকাশ বলে, উপেক্ষা করতে পারি। গত ত্রিশ বছরে যা হয়নি, একজনের মুখের কথাতেই তা হয়ে যাবে, এমন আশঙ্কায় বৈরী নাগাদেরও নতুন করে ভীত-সন্ত্রস্ত না হবারই কথা।

আসল কথা এই যে, নাগাল্যাণ্ডে গত ত্রিশ বছর ধরে যে লড়াই চলছে কেবল অস্ত্রের সাহায্যে সে লড়াইয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। একাধিক কারণে সম্ভব নয়। তার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, একটা সামরিক বাহিনী অপর একটি সামরিক বাহিনীকে যুদ্ধে হারিয়ে দিতে পারে, কতিপয় বেয়াড়া বিদ্রোহীকেও টিট্ করতে পারে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে, কিন্তু তার পক্ষে পুরো একটা জাতিকে, পুরো একটা সমাজ ব্যবস্থাকে স্থায়ীভাবে জব্দ করে দেওয়া সম্ভব নয়। সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে তার অনেক নজির আছে। পুরো একটা জাতি, এমনকি বাড়ির কুকুরটা বেড়ালটাকে নিয়ে পুরো একটা জাতি যখন মরণপণ করে প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন এমনকি বি-৫২ বোমারু বিমানও সে প্রতিরোধ ভাঙতে পারে না। অপেক্ষাকৃত খাটো মাপের সমরাস্ত্র নিয়ে, অপেক্ষাকৃত খাটো মাপের প্রতিরোধ ভাঙবার চেষ্টা নাগাল্যাণ্ডেও গত ত্রিশ বছর ধরে

ব্যর্থ হয়েই চলেছে। অসল কথা যুদ্ধ চালাতে হলে জানা প্রয়োজন যে প্রতিপক্ষের প্রাণভোমরাটি ঠিক কোথায় আছে। এ ব্যাপারে নিজের প্রচার যন্ত্রের উপর নির্ভর করা চলবে না। নাগাল্যাণ্ডে সত্যকারের শান্তি প্রতিষ্ঠা যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তবে আর বিলম্ব না করে আমাদের বোঝা উচিত যে নাগাল্যাণ্ডে যারা গত ত্রিশ বছর ধরে উৎপাত করে চলেছে তারা কতিপয় বিক্ষিপ্ত বিক্ষুব্ধ যুবক মাত্র নয়—তাদের সঙ্গে আছে পুরো নাগা জাতি। হয়তো ভুল করে, কিন্তু ওরা বিশ্বাস করে যে সংকটটা আসলে অস্তিত্বের সংকট।

কথাটা যদি অতিশয়োক্তি বলে মনে হয় তবে আমি নাচার। কয়েকটি নাগা গ্রামে বেশ কয়েকবার গিয়ে, থেকে, আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, গীতা ছুঁয়ে বলতে পারি, তা হোল : নাগাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন মনে-প্রাণে গৃহে-ভাণ্ডারে সদা-সর্বদা বৈরীদের সঙ্গে আছে। আর বাকী ৫ জন আমাদের আমলাতন্ত্রের গাড্ডায় হাবুডুবু খেয়ে এখন নো-ম্যানস্ ল্যাণ্ডে। এসব তথ্য বলে দেবার প্রয়োজন হয় না। সরকারী চলনদার সঙ্গে নিয়ে কোন নাগা গ্রামে ঢুকলেই গাঁয়ের কুকুরটি দূর থেকে ঘেঁাং ঘেঁাং করতে করতে পিছিয়ে যাবে। গাঁয়ের কাচ্চাবাচ্চাগুলো যা হোক কিছু একটার পিছনে গিয়ে লুকোবে এবং অদ্ভুতভাবে তাকাবে—আমাদের শয়নঘরে যদি হঠাৎ এক লাল-পাগড়ি পুলিশ এসে ঢোকে তবে আমাদের বাচ্চাটি যেমন অদ্ভুতভাবে তাকাবে—একবার বাড়ির পরিচিত মুখগুলোর দিকে আর একবার আগন্তুকের দিকে—অনেকটা সে-রকম। গ্রাম প্রাঙ্গণের কোণের দিকটায় বসে যে আশীতিপর বুড়ো বেতের ডালা বুনছে এবং যে বুড়ি লঙ্কা ছড়িয়ে শুকোতে দিয়ে একটা কাঠির সাহায্যে তা নেড়েচেড়ে দিচ্ছে—দু'জনেই চাপা আক্রোশে ফেটে পড়ছে। এসব কাউকে ব্যাখ্যা করে দিতে হয় না। কোহিমাতে সন্ধ্যের দিকে কোন নাগা পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে বসলে দেখা যাবে, পানীয়ের সঙ্গে মাত্রা রক্ষা করে পদস্থ ব্যক্তির মতামত পাল্টে যাচ্ছে :

'ভারতের উদারতায় আমাদের কি বিশাল অগ্রগতি হয়েছে' পাল্টে গিয়ে দাঁড়ায় 'ইউ ইণ্ডিয়ানস, আমরা কি চাই তা তোমরা জানই না, কারণ দীর্ঘকাল আগেই তোমরা তা হারিয়ে বসে আছ।' এরপরে আর পদস্থ ব্যক্তির লয়্যালটি-ট কোথায় তা যাচাই করবার প্রয়োজন হয় না। কতিপয় নাগা বৈরীর সঙ্গে এরাও যুদ্ধক্ষেত্রে আছে।

যুদ্ধক্ষেত্রটিও স্বভাবতই নাগাদের অনুকুল। পাহাড়ময় এলাকা, ছোট-বড় সুগম-দুর্গম অজস্র উপত্যকা – পথ জানা থাকলে পাহাড়ের এদিক দিয়ে ঢুকে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে আসা যায়। এমন টেরেইনে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সহজ, যুদ্ধে জেতা শক্ত। যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়িত্বের দ্বিতীয় প্রধান কারণ এই টেরেইন। এর তৃতীয় প্রধান কারণ: নাগাল্যাণ্ডের সমগ্র পূর্ব দিকটা ব্যেপে সুবিস্তৃত এক আন্তর্জাতিক সীমারেখা। এই সীমারেখার অপর দিকে ব্রহ্মদেশের জঙ্গলাকীর্ণ উত্তরাঞ্চল। অঞ্চলটা রেঙ্গুন সরকারের এক্তিয়ারে থাকলেও তার নাগালের বাইরে। এই সীমান্তরেখার অনেক অঞ্চলেই অদ্যাবধি বর্মী প্রশাসন গিয়ে পৌঁছতে পারেনি। সীমান্তের দু-দিকেই নাগা গ্রাম, নিত্য আনাগোনা নিত্য বেচাকেনা। এদিকে জাল ফেললেই ভুস করে ডুব দিয়ে ওদিকে গিয়ে ওঠে। জালটা নাইলন সূতোর হলেও এমন লুকোচুরি খেলায় এদের সঙ্গে এঁটে ওঠা শক্ত। ব্রহ্মদেশ সরকার বহুবার ভারত সরকারকে আশ্বাস দিয়েছে যে এরপর পাহারাদার বসিয়ে ওদের দিকটা ওরা একেবারে অভেদ্য করে রাখবে। হয়তো করেও থাকবে, কিন্তু লুকোচুরি খেলা তবু ত্রিশ বছর ধরে অব্যাহত চলেছে। এসব থেকে এটুকু বোঝা গেল যে অদূর-ভবিষ্যতে নাগাদের দম ফুরিয়ে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। ওদের দিক থেকে যুদ্ধ থামিয়ে দেবারও কোন আশু প্রয়োজন নেই, যুদ্ধটা চালিয়ে যাবার প্রয়োজন আছে। এ যুদ্ধ চট্ করে নিষ্পত্তি হবার নয়।

আমাদের দিক থেকেও তার জন্য খুব একটা তাড়া নেই।

কোহিমায় দিনমানে সরকারী মহলের উপরতলায় একটু ঘোরাঘুরি করলেই সবকিছু দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। লড়াইটা চলতে থাকলে আমাদের সকলেরই লাভ।

সামরিক বিভাগের কাছে এইটে একটা ট্রেনিং গ্রাউণ্ড—তুড়ি দিলেই প্রকৃত শত্রু বেরিয়ে আসে—এখানে প্রকৃত যুদ্ধের মহড়া হয়। এখানে ট্রান্সফার হয়ে এলে অফিসারদের পদোন্নতি হয়। এমন অভিযোগও আছে যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অস্ত্র-শস্ত্র নিয়েই বৈরী নাগারা লড়াই করে। চীন থেকে অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারটি একেবারেই ভুয়ো—নিছক ভৌগোলিক কারণেই তা অসম্ভব ও অবাস্তব। অতএব গান-রানিং মানে বন্দুক চালাচালি করেও এখানে দুটো উপরি পয়সা হয়।

অপরদিকে বেসামরিক প্রশাসন কোহিমায় গত ত্রিশ বছর ধরে কেবল হাই তুলছে। রাজ্যের কার্যভার সব সামরিক বাহিনীর হাতে—প্রশাসনের কাজ শুধু ঢ্যাঁরা মারা। ওই ঢ্যাঁরার জোরেই দিল্লি থেকে টাকা আসে, ওই ঢ্যাঁরার জোরেই সে টাকা ঠিকাদার সাপ্লায়ারদের মধ্যে বিলি হয়। দুর্নীতি এমন পরিবেশে ঝাণ্ডা উঁচিয়ে চলাফেরা করে। প্রশাসনের বড় বড় অফিসাররা সকলেই এখানে দু'চার বছরের জন্য মাত্র আসেন। এত দূরে—বদলিটাকে প্রথমটায় নির্বাসন বলেই মনে হয়। সংখ্যাল্প দু'চারজন অরসিক এখান থেকে চলে যেতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বেঁচে যায়। অন্য অধিকাংশই খুব রসিক লোক, সন্ধ্যার পর কোহিমার নির্জন-শীতে এদের সুরাসিক্ত কলকলানি শুনলে প্রথমেই মনে হয়: নাগাল্যাণ্ড সামলাবার ভার পড়েছে এদের উপর!

ব্যাওসায়ী ও ভাগ্যান্বেষী ঠিকাদারদের দিক থেকেও বিরোধটা বিলক্ষণ লাভজনক। ত্রিশ বছর ধরে কোন জায়গায় যুদ্ধ চলতে থাকলে সেখানকার অর্থনীতিটাই সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধ নির্ভর হয়ে পড়ে। কোহিমার ব্যাওসায়ীরা ভালো করেই জানে যে লড়াইটা আজ থেমে

গেলে কালই গণেশ ওল্টাতে হবে। তাছাড়া পাঁচ পয়সার জিনিসটি আণ্ডারগ্রাউণ্ডের কাছে দশ পয়সায় বেচার মধ্যেও একটা দারুণ মজা আছে। অপরদিকে, বৈরী নাগারা যদি মাঝে মধ্যে রাস্তাটা, ব্রিজটা, নিদেনপক্ষে ক্যালভার্টটা উড়িয়ে না দেয়, ঠিকাদার তা হোলে অনন্তকাল ধরে ঠিকাদারীটা করবে কোথায়? অতএব লড়াইটা যাতে চলতেই থাকে সেজন্য এরা কেবল ভক্তিভরে গণেশজীর পূজো দিয়েই ক্ষান্ত হন এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই।

আমাদের সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা একটা খুব বড় কথা। যুদ্ধটা চলবে কি থামবে সে ব্যাপারে আমাদের নাক গলাবার কথা নয়। সরকারের তরফ থেকেই আমাদের নাগাল্যাণ্ডে মাঝে মাঝে নিয়ে যাওয়া হয়, কয়েকটি জায়গা ঘুরিয়ে দেখানো হয়। সরকারী কর্মচারীদের উপস্থিতিতেই খুব নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা গ্রামবাসী নাগাদের ইন্টারভিউ নিই। তারপর বেলা থাকতে থাকতেই কোহিমায় ফিরে এসে সালংকার রিপোর্ট লিখতে বসি। একটু তাড়াতাড়ি লিখতে হয় কেন না সন্ধ্যের আগেই টেলিগ্রাম ধরাতে হবে, আর সন্ধ্যের পরে যেতে হবে অমুক অফিসারের বাড়ি। আর তারপর?– সাংবাদিকদের খাতির কমে যাচ্ছে বলে যারা বিলাপ করে নাগাল্যাণ্ডে তাদের নিমন্ত্রণ রইল। নাগাল্যাণ্ডের আতিথেয়তা গ্রহণ করতে করতেই আমাদের মধ্যে কতজন নাগাল্যাণ্ড সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলাম। আমরা মাঝে মাঝে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখে দেখেছি – নাগা সমস্যার সমাধান করা শিবেরও অসাধ্যি।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? ব্যাপারটি যে সহজ নয় তা মানতেই হবে। কিন্তু একেবারেই কি অসম্ভব? লড়াইয়ের মাঠে যে রফার কোন সম্ভাবনা নেই তা আমরা দেখেছি। মোরারজী দেশাইয়ের দাম্ভিকতায় আরও রক্তপাত হতে পারে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না। অতএব একমাত্র পথ রইল আলাপ-আলোচনা। এর আগে উভয় পক্ষে একাধিকবার আলাপ-আলোচনা হয়েছে।

প্রতিবারই শেষ পর্যন্ত ফেঁসে গেছে তবুও বারম্বার আলাপ আলোচনায় বসা হয়েছে। তার মানে, এমন দুটো একটা বিষয় অবশ্যই আছে যা নিয়ে উভয় পক্ষ অন্তত আলাপ-আলোচনায় বসতে পারে। এই সব আলোচনা কোন সফল হয়নি তা অনুমান করা শক্ত নয়। নানাস্তরে কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীর নানাবিধ সংগঠিত অথবা স্বতস্ফূর্ত ষড়যন্ত্রের ফলেই এইসব আলোচনার কোন কোনটি অঙ্কুরিত হলেও একটাও ফলবতী হয়নি। তবে কায়েমী-স্বার্থ তুঁতের জল না ছড়ালেই এইসব আলোচনা থেকে নাগা-সমস্যায় সমাধানটি গজিয়ে উঠত এমন কথা বলা যায় না।

সব কাজের জন্যই, দুই বিবদমান পক্ষের শান্তি আলোচনার সময় তো বটেই, সকলের আগে যা প্রয়োজন তা হল একটা উপযুক্ত পরিবেশ। উভয় পক্ষই খোলা মন নিয়ে আসবে, পরস্পরের কথায় আস্থা রাখবে, নির্ভয়ে মতামত ব্যক্ত করবে, প্রতিহিংসার আশঙ্কায় শিটিয়ে না থেকে তর্কাতর্কি করবে, নিজেদের পদাধিকারের কথা সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে একজন মানুষ যেমন করে আরেকজন মানুষের সঙ্গে কথা বলে তেমনি করে কথা বলবে, ধৈর্য, সহানুভূতি, সমবেদনা ইত্যাদি ঝুল পড়া বাতিগুলোকে আগে থাকতে সাফ করে রাখতে হবে—এইসব হলেই তবে আলাপ-আলোচনা সফল হয়। এইসব যত অকৃত্রিম হয়, সফলতাটিও ততটাই স্থায়ী হয়।

কোন পক্ষ কখন কোন ব্যাপারে কতটা আন্তরিক ছিল তা মাপবার কোন যন্ত্র নেই। অতএব একথা জোর দিয়ে বলা চলবে না যে নাগাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় ভারত সর্বদাই অনান্তরিক ছিল। তবে দুষ্ট লোকে মন্দ কথা বলে। তারা বলে, ভারত কখনোই শান্তি আলোচনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করেনি, বরং তার উল্টোটা করেছে। সভাস্থল নির্বাচিত হয়েছে দিল্লিতে, শিলঙে অথবা কোহিমায়—অর্থাৎ অত্যন্ত সুরক্ষিত তিনটি ঘাঁটিতে। আলোচনা ঘনঘন চলছে, ঠিক তখনো ভারতের

সেনাবাহিনী এল এম জি উঁচিয়ে নাগাল্যাণ্ড পাহারা দিচ্ছে। একটা অস্ত্র-সংবরণ চুক্তি অবশ্য আছে কিন্তু সবাই জানে যে ওইসব চুক্তি ফুক্তি মানতে গেলে নাগাল্যাণ্ড সামলানো চলে না। তার উপরে পরস্পরের উপর শ্রদ্ধা, মেপে দেখতে পারো এক মিলি-গ্রামেরও কম। এমন অবস্থায় কোন আলোচনা সফল হতে পারে? আমরা বলি, ওদের সঙ্গে যে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছি সেটাই বাপের ভাগ্যি।

তবে এমন পরিবেশ এবং এমন মনোভাব নিয়ে যে কোন শান্তি-আলোচনা সফল হয়না তা স্বীকার করতেই হয়। অতএব প্রথমেই আমাদের সঠিক রূপে জানা প্রয়োজন যে নাগাল্যাণ্ডে আমরা সত্যিই শান্তি চাই কি না। নাগাল্যাণ্ডে শান্তি এলে সেখানে গত ত্রিশ বছর ধরে যে মধুচক্রটি গড়ে উঠেছে সেটাতে ঢিল পড়বেই, এইটে বেশ ভালো করে বুঝে নিয়ে আমাদের জানা প্রয়োজন: নাগাল্যাণ্ডে আমরা সত্যিই খুনোখুনির অবসান চাই কি না।

কতিপয় দুর্নীতিগ্রস্থ আমলা, ব্যাণ্ডসায়ী ও ভাগ্যান্বেষীর জন্য ত্রিশ বছরের পরেও একটা খুনোখুনি চলতে থাকুক এমন কথা প্রকাশ্যে কেউ কখনো কবুল করে না। অতএব পলকের জন্য মনকে চোখ ঠাউরে না হয় ধরে নেওয়া গেল যে, নাগাল্যাণ্ডে আমরা সত্যিই শান্তি চাই। তাহোলে তারপর আমাদের আরও কয়েক পা এগোতেই হবে।

প্রথমেই প্রয়োজন একটি নিষ্কলুষ সভাস্থলের। সেজন্য তৃতীয় কোন রাষ্ট্রের রাজধানীতে বা জেনিভায় যাবার প্রয়োজন নেই। ভারতেরই কোন নির্জন সৈকতাবাস বা সামরিক-বাহিনীর ছোঁয়াচ-মুক্ত কোন শৈলাবাস হলেই কাজ চলে যাবে। তারপরে, এই আলোচনায় প্রচুর সময় লাগবে। নাগা সমস্যাটা এমনিতেই অত্যন্ত জটিল, তাছাড়া যথেষ্ট কেতা-দুরস্ত নয় বলেই হয়তো সমতলবাসীদের কথা বুঝতে পার্বত্য উপজাতিরা প্রচুর সময় নেয়। মেঘালয়ের

জন্মের আগে পার্বত্য সর্বদলীয় সম্মেলনের বৈঠকের সময় এ জিনিষ বহুবার লক্ষ্য করা গেছে। প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে ঐক্যমতে এনে তবে এরা এদের সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে। সে যাই হোক, এ কাজের জন্য এমন একজনকে নিয়োগ করতে হবে যার হাতে অঢেল সময়, যার কোন স্থায়ী পিছুটান নেই, যার নিরপেক্ষতার সুখ্যাতি না থাকুক কিন্তু পক্ষপাতিত্বের দুর্নাম নেই। ভূমিকাটি জয়প্রকাশ নারায়ণের মাপে ছাঁটা—গত ত্রিশ বছরে মাত্র একবার তাঁকে কেবল উইংসের পাশ থেকে উঁকি মারতে দেওয়া হয়েছে। জয়প্রকাশ এখন পরলোকে। তবে ডাক পড়লে কাজ চালিয়ে নেবার মতো লোক ভারতে এখনো দু'চারজন আছেন। ধরে নেওয়া যাক, এই দুটো প্রস্তাব গ্রহণ করবার মতো মহানুভবতা আমরা দেখালাম। কিন্তু তৃতীয় প্রস্তাবটি শুনলে কট্টর কোন গান্ধীবাদীও হৈ হৈ করে উঠবেন। তবে নাগাল্যাণ্ডে হয়তো ঠিক এই মুহূর্তেই একটি শান্ত-স্নিগ্ধ পাহাড়ী গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে এই কথা স্মরণ রেখে প্রস্তাবটি না হয় শোনাই যাক।

নাগাল্যাণ্ড থেকে সৈন্য সরিয়ে আনবার প্রস্তাব প্রথমটায় একেবারে অসম্ভব ও অবাস্তব বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। একে তো দেশরক্ষার প্রশ্ন এ সঙ্গে জড়িত, তাছাড়া, প্রস্তাবটি শুনেই আমাদের জাতীয়তাবোধ শিউরে উঠবে। প্রস্তাবটি কিন্তু সত্যিই তেমন উদ্ভট নয়। কলকাতায় যদি কখনো কোন কারণে সামরিক বাহিনী নামাতে হয় এবং পরে প্রয়োজন ফুরোলে তা আবার তুলে নেওয়া হয় তবে তাতে কি আমাদের জাতীয়তাবোধ আহত হয়? যদি বলেন কলকাতার সঙ্গে কোহিমার কোন তুলনা হয়? তাহোলে কিন্তু সেই সঙ্গেই বৈরী নাগাদের দাবী বহুলাংশে মেনে নেওয়া হল। কেন না, ওরাও বলে যে নাগাল্যাণ্ড ঠিক ভারতের অন্য দশটা রাজ্যের মতো নয়। তাছাড়া যে দেশের পঁয়ত্রিশ হাজার বর্গমাইল এলাকা পররাজ্যের অধীনে অনির্দিষ্ট কাল অনায়াসে [illegible] থাকতে পারে,

সে দেশের জাতীয়তাবোধ নাগাল্যাণ্ড থেকে সৈন্য সরিয়ে আনলেই মূর্চ্ছা যাবে এমন মনে করবার কোন কারণ নেই।

এবারে নিরাপত্তার প্রশ্ন। নাগাল্যাণ্ড একটি সীমান্ত রাজ্য একথা ঠিক। বলা যায় চীনের সঙ্গে যতদিন আমাদের শান্তি না হয় ততদিন সীমান্ত এলাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এই সীমান্ত রেখার অপর দিকে আছে ব্রহ্মদেশের জঙ্গলাকীর্ণ উত্তরাঞ্চল সেখানে রেঙ্গুনের হুকুমও পৌঁছায় না। ভয়টা চীনের। নাগাল্যাণ্ড থেকে চীনের নিকটতম দূরত্ব দেড় মাস থেকে দুই মাস। এই পায়ে চলা পথ এমনই দুর্গম এবং বিপদসংকুল যে মাইল-কিলোমিটারে এর দৈর্ঘ্য মাপা হয় না, এখানে পড়াও-এর হিসাব। এরপর ধরে নেওয়া যাক যে চীন সুযোগ পেলেই আবার কারণে হোক অকারণে হোক ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে। কিন্তু সে নাগাল্যাণ্ডের সীমানায় আসতে যাবে কোন দুঃখে। ভারতের টুঁটি চেপে ধরবার জন্যই হোক অথবা তামাশা করবার জন্যই হোক, চীন মরতে এই নাগা সীমানায় আসতে যাবে কেন? অতএব নাগাল্যাণ্ড থেকে সৈন্য সরিয়ে আনলেই দেশের নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে একথা ধোপে টেঁকে না। আমাদের সেনা বাহিনী নাগাল্যাণ্ডে সীমান্ত পাহারা দেয় না, আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার-জন্যই তারা সেখানে নিযুক্ত আছে।

কোমল প্রাণে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহোলে নাগাল্যাণ্ডের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবেটা কে? একাদিক্রমে ত্রিশ বছর শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবার পর, নির্ধারিত কয়েকটি দিনের জন্যও, যদি আমরা মুঠোটা সামান্য আলগা করতে ভয় পাই তবে সেটা আমাদের নাগাল্যাণ্ড অথরিটির পক্ষে গৌরবজনক নয়। আর নিজেদের মধ্যেই কাটাকাটি করে, ইত্যবসরে, নাগারা যদি সব ফৌত হয়ে যায় তবে তো সমস্যাটিরই নিষ্পত্তি হয়ে গেল। নাগাল্যাণ্ডে বসবাসকারী সমতলবাসীদের নিরাপত্তার কথাও উঠবেই এবং আরও অজস্র

ফ্যাকড়া। তবে যদি আমরা সত্যই বিশ্বাস করি যে নাগা-সমস্যার অবিলম্বে সমাধান হওয়া প্রয়োজন তাহোলে এইসব খুচরো ঝঞ্ঝাট মেটাতে সময় লাগবে না। যেমন কথা উঠতে পারে যে, সামরিক বাহিনী তুলে নিলে পুরো নাগাল্যাণ্ডটাই তো আত্মগোপনকারীদের দখলে চলে যাবে। তখন? তখন যদি প্রয়োজন হয়, যদি আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় তবে সামরিক বাহিনী আবার নাগাল্যাণ্ডে ফিরে যাবে। নতুন করে রক্তপাত হবে বলে আমাদের কুণ্ঠিত হবার কোন অধিকার নেই, তাছাড়া সেই রক্তপাতের সম্পূর্ণ বৈধ যুক্তি থাকবে।

অপরদিকে, নাগাল্যাণ্ড থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নিলে সেখানকার আবহাওয়া সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। একজন শিক্ষিত নাগার ভাষায়, ত্রিশ বছর পরে আবার সূর্যোদয় ঘটবে। নাগাল্যাণ্ডে দু'চারবার যাতায়াত করলেই এই কথাটির তাৎপর্য পরিস্কার বোঝা যায়। নাগাল্যাণ্ডে এমনিতে ঋতু বলতে দুটি—বর্ষা আর শীত। হয় মেঘ, নয় কুয়াশা। তার সঙ্গে ত্রাস-সন্ত্রাস মিলে সেখানকার আবহাওয়াটা সম্বৎসরই গুমোট হয়ে আছে। কেউ জোরে কথা বলে না, পাছে পাশের লোকটির কানে যায়! কেউ জোরে হাসে না, দূর থেকে পাছে কেউ বিদ্রূপ বলে মনে করে। বন্ধুরাও রেখে ঢেকে কথা কয়, কে জানে দুজনের মধ্যে একজন—হয়তো দু'জনই—শত্রুপক্ষের লোক! সেনা-বাহিনী সরিয়ে নিলেই এই সব কুয়াশা কেটে যাবে, স্বাভাবিক হাওয়া বইবে। নাগাদের, এবং ভারতেরও, স্বাভাবিক বিচার শক্তি ফিরে আসবে। সত্যকারের করমর্দনই যদি অভিপ্রেত হয় তবে প্রথমে দেখা দরকার যে উভয়ের কারো হাতেই হাতকড়া লাগান নেই।

এতদূর পর্যন্ত এগুনো গেলে তারপরে আর খুব একটা ভাবনা থাকবে না। উভয় পক্ষই আলোচনায় রাজি হয়েছে, অতএব ধরে নিতে বাধা নেই, যে উভয় পক্ষই নিজেদের দাবী-দাওয়া কিছুটা

কাট ছাট করতে রাজি আছে। নইলে আর আলোচনা কিসের। এইবার উভয় পক্ষকেই খুব ভালো করে চিন্তা-ভাবনার পর স্থির করে নিতে হবে, যে কোন কোন ব্যাপারে ঠিক কতটুকু করে ছাড় দেওয়া সম্ভব। নাগাদের বিচার করে দেখতে হবে যে ঠিক কতটা সার্বভৌমত্ব তাদের না হলেই নয়। ভারতকেও পরিস্কারভাবে তার দেশরক্ষার বিষয়টি বিচার করে দেখতে হবে—দেশরক্ষার জন্য নাগাল্যাণ্ডের উপর ঠিক কতটা আধিপত্য থাকা দরকার। অন্ধ-সংস্কার কাটিয়ে বিচার করলে হয়তো দেখা যাবে একজনের দেশরক্ষার প্রয়োজনে অন্যজনের সার্বভৌমত্ব পুরোপুরি বিসর্জন দেবার প্রয়োজন নেই কিম্বা একজনকে একটু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিলেই অন্যজনের সার্বভৌমত্ব লাঞ্ছিত হয় না। কথায় বলে, লোক যদি হয় সজ্জন, তেঁতুল পাতায় নয়জন।

অতএব কে বলে যে নাগা-সমস্যার কোন সমাধান নেই? কাগজে-পত্রে এই তো দিব্যি সমাধান হয়ে গেল! বাস্তবেও হবে, উভয় পক্ষ যদি এ-ব্যাপারে আন্তরিক হয়। এই আন্তরিকতা প্রমাণ করবার জন্য ভারতকেই অগ্রণী হতে হবে। একমাত্র ভারতের পক্ষেই আলোচনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। আর ভারতের নিজের স্বার্থেই তা করা প্রয়োজন।

নাগাল্যাণ্ডের লড়াই আর চলতে দেওয়া নিরাপদ নয়। সুদূর পূর্ব-সীমান্তে ক্ষুদ্র একটি ক্ষত—দিল্লি থেকে চোখেই পড়ে না। টাকা আর কার্তুজ দিয়েই বশে রাখা যায়। কিন্তু সুবিস্তৃত পূর্বাঞ্চলের ছোট বড় সব উপজাতি তাকিয়ে আছে এই লড়াই-এর দিকে। দুর্নীতি যত বাড়ছে, সমাজ ব্যবস্থা যত ভেঙে পড়ছে, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান যত দুস্তর হচ্ছে—ততই অসন্তোষ জমা হচ্ছে উপজাতিদের মধ্যে। মিজোরামে আগুন জ্বলছে, মণিপুর অগ্নিগর্ভ, মেঘালয়েও দেয়ালে পোস্টার পড়েছে, সমতলবাসীর গাড়িতে ঢিল পড়েছে। উত্তরবঙ্গে অথবা আসামে এমন একটা

উপজাতি নেই যারা অসন্তুষ্ট নয়, বিক্ষুব্ধ নয়, সুযোগ পেলেই যারা ফেটে পড়বে না। পশ্চিমবঙ্গে ও ত্রিপুরায় বামপন্থী সরকার। আগুনটা একটু ছড়াতে পারলেই দাবানল হয়ে উঠবে।

মোরারজী দেশাই অবশ্য ইতিমধ্যে আরও একবার বৈরী নাগাদের শায়েস্তা করবার চেষ্টা করতে পারতেন। সে অধিকারও তার ছিল···।

গত কিছু কাল মিজোরামে আবার হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই হাঙ্গামা থামাবার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছেন সেনা-বাহিনীকে ডেকে আনা হয়েছে, প্রভূত পরিমাণ আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে—কিন্তু হাঙ্গামা তবুও থামেনি। অদূরভবিষ্যতে এই হাঙ্গামা থামবে—মিজোরামে স্থায়ী শান্তি ফিরে আসবে—এমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

মিজোরামের এই অতি-সাম্প্রতিক হাঙ্গামার খবরাখবর আমাদের সকলেরই মোটামুটি জানা আছে। বিচ্ছিন্নতাকামী বৈরীদের মুখে 'কুইট মিজোরাম' স্লোগানটি আমাদের অনেকের কাছেই অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ মনে হয়েছে। 'কুইট ইণ্ডিয়া' কথাটির সঙ্গে একটু মিল আছে বলেই হয়তো স্লোগানটি আমাদের কাছে একটু বেশি স্পর্ধাপূর্ন মনে হয়। সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, মহাত্মাজীর স্মৃতি-বিজড়িত কুইট ইণ্ডিয়া বা ভারত ছাড় আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গৌরবময় অধ্যায়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের প্রতি ভারতের শেষ হুংকার—ভারত ছাড়। সিকি-শতাব্দী ঘুরতে না ঘুরতে আজ কিনা সেই ভারতবর্ষকেই বলা হচ্ছে—মিজোরাম ছাড়। বলছেন কারা? —না, কতিপয় বিচ্ছিন্নতাকামী, বিপথগামী, উগ্রপন্থী মিজো! যাদের মাত্রাজ্ঞান এমন উৎকট তাদের দ্বারা সব-কিছুই সম্ভব—মিজোরামের পরবর্তী বীভৎস ঘটনাবলী তাই আর আমাদের কাছে তেমন বিস্ময়কর মনে হয়নি—ক্ষ্যাপারা তো ক্ষ্যাপামি করবেই।

তবে আমরা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ তুলতে ভুলিনি—এমন একটা কুৎসিত ঘটনা যে ঘটতে চলেছে তা

আমাদের অতন্দ্র নিরাপত্তা বাহিনী আদৌ আন্দাজ করতে পেরেছিল? হাঙ্গামাটাই বা এতদিন চলতে দেওয়া হচ্ছে কেন,

নিরাপত্তা বাহিনী কি আরেকটু তৎপর হতে পারে না, বা প্রয়োজন হলে আরও একটু নিষ্ঠুর! সীমান্ত অঞ্চলে এসব চলতে থাকা গো ঠিক নয়।

সময়ে এই হাঙ্গামা থেমে যাবে—এর আগেও প্রত্যেকবারই থেমেছে, এবারেও থামবে। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। লালডেঙাকে বন্দী করা হয়েছে। মিজোরামে সর্ববিধ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়েছে। বিদ্রোহীদের নিঃশেষে ছেঁকে তুলবার জন্য ব্যাপকভাবে ছাঁকনি অভিযান চালানো হচ্ছে। এই অবস্থায় আরও কিছু ঘটনা ঘটতেই পারে। কিন্তু সময়ে এই হাঙ্গামা ঠিক থেমে যাবে। তবে মিজোরামের শান্তি ঠিক ততদিনই স্থায়ী হয় যতদিন পর্যন্ত বিস্ফোরণটি না ঘটে। উগ্রপন্থীদের উন্মাদনা থেকে থেকেই ক্ষেপে ওঠে।

গত ১৯৬৬ সন থেকে—দেড় দশক হতে চলল—এমনি ধারা চলে আসছে। বহুবার সগৌরবে ঘোষণা করা হয়েছে যে—মিজোরামে এরপর স্থায়ী শান্তি। বৈরী মিজোরা দফায় দফায় ফটোগ্রাফার ও সংবাদদাতাদের উপস্থিতিতে, তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিঃশেষে সমর্পণ করেছে। কিন্তু প্রতিবারই আসর যখন বেশ জমে ওঠবার মতো হয় তখনই একটা বিস্ফোরণ ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাক্রম আবার পরিচিত পথটি ধরে গড়াতে শুরু করে। আবার সেই নরহত্যা, থানা আক্রমণ, নিরাপত্তা বাহিনীর উপর হামলা এবং আবার সেই বহুবিধ নিষেধাজ্ঞা, ছাঁকনি অভিযান, সুসংরক্ষিত গ্রাম ইত্যাদি।

এই একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে আমাদের রাজনৈতিক নেতারা এবং সংবাদপত্রগুলিও—মাঝে মাঝে বলে থাকেন যে, মিজো সমস্যার একটা ভিন্ন রকম সমাধান প্রয়োজন। ভিন্ন রকম সমাধান মানে রাজনৈতিক সমাধান। কিন্তু রাজনৈতিক শব্দটি উচ্চারণ করবার অসুবিধা এই যে, বিষয়টিকে তাতে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া

হয়, তা ছাড়া সংবিধানগত অসুবিধাও আছে। সে যাই হোক, নেতারা কিন্তু এই কথাটি এতদিন পর্যন্ত কেবল বক্তৃতামঞ্চ থেকেই, বড় জোর সাংবাদিক বৈঠকে ব্যক্ত করেছেন। ঘটনাক্রম যেমন ধারায় গড়াবার তেমনই গড়িয়েছে।

কিন্তু তবুও এই কথাটির একটু গুরুত্ব আছে। এই কথায় অন্তত এইটুকু স্বীকৃত হয়েছে যে, এতকাল সেই পন্থায় তল্লাস চালানো হয়েছে যে পন্থায় মিজোরাম সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। নেতারা এই পর্যন্ত বলেই থেমে যান—এর পরে তাঁদের আর কিছু বলতে মানা—কেননা, স্বীকৃতিটুকু ব্যাখ্যা করতে গেলেই একরাশ অপ্রীতিকর প্রশ্ন নিষ্পত্তি করতে হয়। গত দেড় দশকের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে মানে গত দেড় দশক ধরে মিজোরামে হত্যাকাণ্ড, অগ্নিকাণ্ড, ধর্ষণকাণ্ড এবং আরও অজস্র যত সব অসামাজিক ও অমানবিক কাণ্ড ঘটেছে তার সব কিছুই অর্থহীন হয়েছে? গত দেড় দশকে মিজোরামে উভয়পক্ষের মোট কতজন লোক নিহত হয়েছে? কতজন আহত হয়েছে? ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে কয়টি? কতগুলো গ্রাম কতবার করে উচ্ছেদ করা হয়েছে? একের পর এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে কিন্তু পালিত হয়নি কেন? বৈরীরা কথা দিয়ে কথা রাখে না? তা হলে বারংবার ওদের সঙ্গে চুক্তি করতে যাওয়া কেন? চুক্তি লঙ্ঘন করবার সাহসই বা ওদের হয় কেমন করে? ভারতের অন্য কোথায়ও সামান্য একটু কিছু ঘটলেই বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করা হয়, অথচ মিজোরামে গত প্রায় দেড় দশক ধরে থেকে থেকে গুলিগোলা চলছে কিন্তু সেজন্য কারও এতটুকু উদ্বেগ নেই কেন? ভারতের একটি রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর উপর ন্যস্ত রয়েছে; ওঁরাই আক্রমণ করছেন এবং আক্রান্ত হচ্ছেন, মারছেন এবং মরছেন; বিভিন্ন খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে এবং হচ্ছে; কিন্তু হাঙ্গামা কিছুতেই থামছে না, আরও ছড়িয়ে পড়ছে;—এমন নিষ্ঠুর

দীর্ঘস্থায়ী ও মহার্ঘ একটি ব্যর্থতা নিয়ে আজও কোন একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হল না কেন ?

আরও একপ্রস্থ প্রশ্ন আছে। গত দেড় দশক মিজো সমস্যার কোন সমাধান হয়নি মানে মিজো সমস্যা তন্মধ্যে আরও জটিল এবং দুরূহ হয়েছে। সমস্যা কখনো স্থির থাকে না, সমাধানের দিকে না গেলেই জটিলতার দিকে যায়। ভুল ওষুধ দেওয়া হলে রোগ ভালো হবার বদলে আরও খারাপ হয়, অনেক সময় রোগী মারা যায়। বিনা বিতর্কে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে, কেবলমাত্র আমলাতন্ত্র ও নিরাপত্তা বাহিনীর তত্ত্বাবধানে গত দেড় দশক ধরে মিজোরামে যে ভুল চিকিৎসা চালানো হয়েছে তারপর রোগীর আজ কেমন অবস্থা ? দৃশ্যতই বিকারগ্রস্ত। কিন্তু ভ্রান্তি স্বীকারের পরেও সেই একই চিকিৎসা-পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন ? শোনা যায়, কোন কোন নীতিভ্রষ্ট ডাক্তার নাকি রয়ে-সয়ে ধনবান রোগীর চিকিৎসা করে —রোগী যাতে হাতছাড়া না হয়। মিজোরামেও কি তাই ঘটছে ? ভারতের ঘোষিত উদ্দেশ্য হল মিজোরামের উপজাতি জীবন-ধারাটিকে ভারতীয় মূল ধারায় (মেনষ্ট্রীম !) সঙ্গে এক করে দেওয়া। গত দেড় দশকের হানাহানির পর সেই সুমহৎ উদ্দেশ্য থেকে কতদূর সরে আসা হয়েছে উভয়ের মধ্যে আজ আর এতটুকু আস্থা নেই, শ্রদ্ধা নেই —শিলচরে অথবা সাইতুলে—বেসরকারী নিরপরাধরাও আজ আর নিরাপদ নয়। ঘটনাচক্র যেদিকে গড়াচ্ছে তার শেষ কোথায় ? পরিণাম কি ?

এই পর্যায়েরই আরেকটা জরুরী প্রশ্ন : এরা এখনো টিকে আছে এবং হাঙ্গামা চালিয়ে যাচ্ছে কেমন করে ? বারংবার বলা হয়েছে যে বৈরী মিজোরা সংখ্যায় নেহাৎই নগণ্য। বলা হয়েছে যে মিজোরামের জনগণ এমনিতে ভারতের প্রতি খুব অনুগত—শতকরা সত্তর আশী জন নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে — এবং বৈরীদের উৎপাতে তারা অতিষ্ঠ। আমাদের সংবাদপত্র-

গুলিতেও এসব কথা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে মাঝে মঝেই ছাপানো হয়ে থাকে। তার উপরে আবার কিছু কিছু বৈরী মিজো মাঝে মাঝে বেশ সাড়ম্বরে অস্ত্র-সমর্পণ করে। কিন্তু, এই সবের মধ্যে যদি কণামাত্রও সত্য থাকত তা হলে—বৈরী মিজোরা আজো টি঳কে আছে, পরাক্রমে বাড়ছে এবং লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে কেমন করে? সমাজের সর্বস্তরে—শিরায় উপশিরায়—লড়াই ছড়িয়ে না পড়লে এ-ধরনের লড়াই—গেরিলা লড়াই—দীর্ঘকাল চলতেই পারে না। জল না হলে মাছ বাঁচে না, সাধারণ মানুষের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া মিজোরামের লড়াই কিছুতেই এতকাল চলতে পারত না। আইজলের সরকারী অপিসে একান্ত অনুগত মিজো কর্মচারীরাও কথায় কথায় বলে—তোমরা ভারতীয়রা! কথাচ্ছলেই প্রমাণ হয়ে যায় যে মিজোরা নিজেদের আদৌ ভারতীয় বলে মনে করে না। প্রায় দেড় দশক ধরে, সব রকম উপায়ে, মিজোরামকে ভারতের পরিবারভুক্ত করবার চেষ্টা করে এই পরিণতি।

এই সঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে হাঙ্গামা ও আগুনের ধর্মই হল ছড়িয়ে পড়া। শোনা যায়, বৈরী মিজোরা নাকি বিক্ষুব্ধ ত্রিপুরীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। খুবই স্বাভাবিক। কর্তৃপক্ষ ভালো করেই জানেন যে বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গেও এদের যোগাযোগ আছে। বস্তুত, এ-ব্যাপারে নাগাল্যাণ্ডই পথিকৃৎ ও পথপ্রদর্শক—এবং নাগাল্যাণ্ডের চিত্রনাট্য সামনে রেখেই মিজোরামের ঘটনাক্রম এগিয়ে চলেছে। মণিপুরেও শান্তি নেই—সামরিক বাহিনীকে সেখানেও মারতে হয়, মরতে হয় এবং ছাঁকনি অভিযান চালাতে হয়—ঘটনার গতি-প্রকৃতি হুবহু একরকম। খানিকটা পিছিয়ে আছে কিন্তু মেঘালয়েও বিক্ষোভ দানা বাঁধছে এবং যে-কোন দিন তা ফেটে পড়বে। অরুণাচলেও জোর কদমে উন্নয়নের কাজ চালু হয়েছে—হাঙ্গামার বীজ বপন করা হচ্ছে—যথা সময়ে ফসলও তুলতে হবে। এইসব ছোট-বড় বিক্ষোভ ও অশান্তি যদি কখনো জোটবদ্ধ হয়—

একদিন তা হবেই—তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? মিজোরামের অতি সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আরও একবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতি সমস্যার আজও কোন সমাধান হয়নি এবং যে কোন দিন এইটে একটা জাতীয় সংকট হয়ে উঠতে পারে। ইতিহাস সব সময়ই আগে থাকতে হুঁশিয়ার করে দেয়, তা উপেক্ষিত হলে তখন আঘাত হানে। তখন আর কোন ক্ষমা নেই।

এ-ব্যাপারে আমাদের গলদ একেবারে গোড়া থেকে। ন্যাজ তুলে এই উপজাতি সমস্যার চেহারা-চরিত্রটা বুঝবার কোন চেষ্টাই আমরা কোনদিন করিনি। স্বাধীনতার পরে অন্য দশটা বিষয়ে আমরা যেমন 'বিজিনেস অ্যাজ উস্যুয়াল, চালিয়ে গেছি—ব্রিটিশদের চলে যাওয়াটা যেন একটা ব্যাপারই নয়।—এই উপজাতিদের বিষয়েও ঠিক তাইই হয়েছে। অন্য দশটা বিষয়ে যেমন জট-পাকিয়েছে, উপজাতিদের বিষয়েও তার অন্যথা হয়নি।

অজ্ঞতাবশতই হোক অথবা শঠতাবশতই হোক আমরা গোড়া থেকেই এই ঐতিহাসিক সত্যটি মনে রাখিনি—এবং এখনও ভুলে আছি—যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতি অধ্যুষিত এই পার্বত্য এলাকাটি ব্রিটিশ আমলের আগে কোনদিনই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই এলাকাগুলো ম্যাপে আনবার জন্য ব্রিটিশদের পৃথকভাবে কোন লড়াইও করতে হয়নি—ব্রহ্মদেশ পৃথক হবার সময় নাগাল্যাণ্ড ও মিজোরাম ভারতের ভাগে পড়ে যায়। এর পেছনে কোন প্রশাসনিক কারণ থেকে থাকলে তা নেহাৎই প্রশাসনিক ছিল। এইসব এলাকায় কোনদিনই ব্রিটিশ শাসন চালাবার চেষ্টা করা হয়নি, কারণ তার কোন ঔপনিবেশিক প্রয়োজন ছিল না—ভিমরুলের চাকে অযথা হাত না দেবার বিচক্ষণতা ব্রিটিশ-দের ছিল। কেবল নজর রাখা যাতে ব্রহ্মপুত্র ও বরাক উপত্যকার চা-বাগিচাগুলোর উপর উপজাতিরা এসে হামলা করতে না পারে।

এলাকাগুলো যখন যেমন এল সেগুলোকে তখন তেমনভাবেই এক একটি জেলা হিসাবে আসামের মানচিত্রের মধ্যে নিয়ে নেওয়া হল। জেলার সীমারেখা টানবার সময়, সঙ্গত কারণেই, উপজাতি এলাকার দিকে একটু মেরে তা টানা হয়ে থাকবে—চা-বাগিচার নিরাপত্তার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু। আসাম ও নাগাল্যাণ্ডের সীমানা বিরোধ এইখানে শুরু। এসব ঘটনা একরকম স্থানীয় উপ-জাতিদের অজ্ঞাতসারেই ঘটে গেল—প্রশাসনের ঘোরপ্যাঁচ অর্ধ সভ্য উপজাতিরা তখন কতটুকু আর বুঝত।

ঔপনিবেশিক যুক্তিতেই ব্রিটিশরা আরেকটি কাজ করেছিল: উপজাতিদের সঙ্গে সমতলের লোকদের কোনরকমেই মেলামেশা করতে দেয়নি। এ-ব্যাপারে যে আমাদের খুব একটা উৎসাহ ছিল তা নয়, তবুও দেশ বিদেশের নৃতাত্ত্বিকদের দিয়ে বই লিখিয়ে আমাদের বোঝান হয়েছে যে, এইসব এলাকার অসভ্য উপজাতিরা স্বভাবতই হিংস্র—সুযোগ পেলেই গলা থেকে মাথা কেটে নেয়। আর পাহাড়ের অপরদিকে বিদেশী মিশনারিরা ওদের বুঝিয়েছে, যে সমতলের লোকেরা সত্য কথা বলতে জানে না, কথা দিয়ে কথা রাখে না, স্বভাবতই শঠ। পাহাড়ের দুই ধারে এই মনোভাব দুটি আজও অক্ষুণ্ণ আছে এবং অবিরত ইন্ধন পেয়ে আরও জোরদার হয়েছে।

সে যাই হোক, ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট আসাম নামে এই প্যাণ্ডোরার প্যাঁটরাটি ভারতের হাতে এল। বিদেশী বণিকের ছেড়ে যাওয়া প্যাঁটরা গোড়া থেকেই একটু বুঝে-শুনে নাড়াচাড়া করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা তখন 'বিজিনেস অ্যাজ উস্যুয়াল' চালিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্র; ব্রিটিশের তৈরী ভিৎ-কাঠামোর ভিতরেই স্বাধীন ভারতের সৌধ গড়ে তুলবার কাজে মেতে আছি। উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতি সমস্যাটি আসলে কি বস্তু—সাপ না ব্যাং? তা জানতে হলে অনেক মেহনত করতে হয়, ত্যাগ স্বীকারের কথাও

উঠতে পারে। আমরা অতএব ধরে নিলাম যে নব-ভারতের স্বতই উদার পলিসিগুলো একবার চালু করে দিলেই কালক্রমে সব জাতের সব রকম সমস্যা আপনা থেকেই সমাধান হয়ে যাবে।

উপজাতিরা আপত্তি করেছিল। বলেছিল, দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় সব ব্যাপারেই আমরা বহুদূর পেছনে পড়ে আছি, এই নতুন ব্যবস্থায় আমাদের উপজাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বিপন্ন হবে, উপজাতীয় সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে, কালক্রমে আমাদের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে। দিল্লির তরফ থেকে তখন আশ্বাস দিয়ে বলা হয়েছে, তেমন দুর্বিপাক যাতে না ঘটে সেদিকে সতর্ক নজর রাখা হবে। উন্নয়নের কাজ এমনভাবে হবে যে উপজাতি সমাজে বা ঐতিহ্যে তার আঁচড়টুকুও লাগবে না। দিল্লির এই ডিম না ভেঙ্গে ওমলেট খাওয়াবার প্রস্তাবের পরেও ওরা যখন গাঁইগুঁই করতেই থাকল তখন আমরা নিশ্চিন্ত হলাম যে এর পেছনে নিশ্চয়ই বিদেশী মিশনারিদের উসকানি আছে।

এই মিশনারিদের সম্পর্কে এখানে দু-কথা বলা প্রয়োজন। একথা সবাই জানে এবং স্থানীয় উপজাতিরাও অস্বীকার করে না যে মিশনারিদের সম্পর্কে এদের একটা বিশেষ রকম দুর্বলতা আছে। না থাকলে অকৃতজ্ঞতা হত। কেন না, এই মিশনারিরা সুদূর গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বিনামূল্যে এদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে, শিশু ও দুস্থদের দুধ দিয়েছে—দয়া নয়, সেবার মনোভাব নিয়ে। মিশনারিদের সঙ্গে সহবৎ করে এরা নিজেদেরকে মানুষ বলে ভাবতে শিখেছে; উদ্দেশ্য যাই হোক, মিশনারিরা এদের ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ করে দিয়েছে। উপজাতি-দের এই সর্বাত্মক কৃতজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মিশনারিরা যদি ওদের কাছে আমাদের নামে দশকথা লাগিয়ে গিয়ে থাকে তবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই—প্রত্যাখ্যাত হলে মিশনারি-মাত্রেই দারুণ ক্ষেপে যায়। এক্ষেত্রে তার উপর আরও অনেক জোরদার ঔপনিবেশিক

যুক্তিও ছিল। কিন্তু এই সব কিছু মেনে নিলেও এমন কথা কিছুতেই মানানীয় নয়, যে কেবল মিশনারিদের প্ররোচনায়ই প্রথমে নাগারা, তারপরে একে একে মিজোরা, ত্রিপুরীরা, মণিপুরীরা সবাই লাইন দিয়ে বিদ্রোহ করতে লেগে গেছে। এমন জিনিস হয় না, কেবল বাইরের প্ররোচনায় কোন দেশে একাদিক্রমে তিরিশ বছর ধরে বিদ্রোহ চলতে পারে না। স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিকাণ্ড হতে পারে, কিন্তু কেবল স্ফুলিঙ্গ সম্বল করেই অগ্নিকাণ্ড স্থায়ী হয় না। এইসব অনির্বাণ জ্বালামুখীর আসল ইন্ধনটা তবে কে অবিরাম যোগান দিয়ে যায়? এইটি অবশ্যই একটা কঠিন প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সঠিক জবাব খুঁজে বার করতে হলে সেজন্য অনেক রকমের প্রস্তুতির প্রয়োজন—আমাদের বর্তমান মেক-আপে সেসব সম্ভব নয়। তা ছাড়া স্বাধীনতারও অনেক আগে থেকেই, বলতে গেলে কংগ্রেসী আন্দোলনের সূত্রপাত থেকেই, জাতীয় স্তরে আমরা স্থির করে নিয়েছি যে সব ব্যাপারে সদাসর্বদা আমরা সবচাইতে সহজ পথটি অনুসরণ করব। —সেই পথে যদি অনন্তকাল গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতে হয় - তবুও।

অতএব একের পর এক নাগারা এবং অন্যান্য উপজাতিরা যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করল, ভারত থেকে বিযুক্ত হতে চাইল, তখন আমরা প্রথম পুরো দোষটা বিদেশী মিশনারিদের উপর চাপিয়ে দিলাম। তাতে যখন আর কুলোয় না তখন নিজেদের দায়মুক্ত রাখতে কিছু বিদেশী রাষ্ট্রকেও টানতে হয়েছে—কিন্তু সেজন্য আমাদের নন-অ্যালাইনমেন্ট পলিসি কলঙ্কিত করা হয়নি—আমরা একই সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ ও চীনকে এই হীন কাজের জন্য দোষী করেছি। কিন্তু এক ভৌগোলিক যুক্তিতেই এইসব গুরুতর অভিযোগ একেবারে নস্যাৎ হয়ে যায়। পূর্ব-পশ্চিম কোন পথ দিয়েই সুদূর্গম নাগাল্যাণ্ডে এমন কিছু পাচার করা সম্ভব নয় যা দিয়ে তিরিশ বছর ধরে একাদিক্রমে বিদ্রোহ চালিয়ে যাওয়া যায়। টাকা?

কেবল টাকার বিনিময়ে যেখানে বিদ্রোহ বাঁধানো যায়, সেখানে টাকার বিনিময়ে আনুগত্যও খরিদ করা যায়। কিন্তু এই বিদ্রোহ বা আনুগত্য কখনোই স্থায়ী হয় না, স্থায়ী হতে পারে না। প্রমাণ নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মণিপুর, মেঘালয় প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহের স্থায়িত্ব এবং সরকারসমূহের ক্রনিক অনিশ্চয়তা।

কিন্তু এইসব গূঢ় কথা বিবেচনা করে দেখবার তখন আমাদের অবকাশ কোথায়! দেশের সুদূর এক কোণে গুটিয়ে অসভ্য-অর্ধসভ্য উপজাতি কয়েকটি অসম্ভব দাবি তুলে একের পর এক আত্মধ্বংসী কাণ্ড করে চলেছে—দিল্লির অন্য দশটা দুশ্চিন্তার তুলনায় এসব নিতান্তই তুচ্ছ। এক্ষেত্রে সব চাইতে সহজ পথ হল: দায়টা মিশনারি ও বিদেশী চক্রান্তের উপর চাপিয়ে দিয়ে দায়িত্বটা আমলাতন্ত্রের উপর সঁপে দেওয়া। ব্রিটিশদের গড়া আমলাতন্ত্র, এসব কাজে সিদ্ধহস্ত।

কিন্তু এইসব অকাট্য যুক্তি ও সুন্দর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও উপজাতিদের আতঙ্ক তবু কাটে না—তখন অগত্যা ওদের স্বকীয়তা রক্ষা করবার জন্য সংবিধানে ষষ্ঠ সিডুল নামে একটা পরিশিষ্ট জুড়ে দেওয়া হল। এই সিডুলে উপজাতিদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখবার ভার ওদের উপরই ন্যস্ত হল—তবে সরকারী তত্ত্বাবধানে। সেই সঙ্গে আয়কর থেকেও ওদের ঢালাওভাবে রেহাই দেওয়া হল। মিশনারি প্রেরণায় এই আয়কর মুকুবের ব্যাখ্যা দাঁড়াল: কৃত্রিম উপায়ে কতিপয় ধনী ব্যক্তি অথবা পরিবার তৈরি করে উপজাতি সমাজে ভাঙন ধরাবার দুরভিসন্ধি। এই তরফে তেমন কোন অভিসন্ধি ছিল কি না বলা শক্ত, তবে গত ত্রিশ বছরে উপজাতি সমাজে সত্যই কতিপয় ধনী ব্যক্তি তথা পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছে, এবং ওদের সমাজও আর আগেকার মতো শ্রেণীহীন নেই।

সে যাই হোক, উপজাতি সমস্যা সমাধানের সেই সাংবিধানিক

প্রয়াস সফল হয়নি।—তার প্রমাণ, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মেঘালয়, অরুণাচল এরা সবাই আসাম রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে বেরিয়ে এসেছে, এবং এদের কেউ কেউ আজ ভারত রাষ্ট্রের মানচিত্র থেকেও বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু ভারত সরকার আজও তবু এই ব্যর্থতাটির কথা অকপটে বা মুক্ত কণ্ঠে মেনে নেয়নি। তার অনেক দায়। তারচাইতে এই ব্যর্থতার জন্যও সেই মিশনারিদের উপরই দোষ চাপিয়ে দেওয়া অনেক সহজ কাজ। পরবর্তী ঝামেলা সামলাবার জন্য আমলাতন্ত্র তো সর্বদাই এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। সংবিধানের ষষ্ঠ সিডুলটি—ব্যর্থ হোক আর সার্থক হোক—সেটিও এই আমলাতন্ত্রের হাত দিয়েই প্রয়োগ করা হয়েছিল। লোকেরা কথায় কথায় ফরাসী আমলাতন্ত্রের গুণগান করে থাকে, কিন্তু আমাদের আমলাতন্ত্রই বা কীসে কম যায়! ত্রিশ বছর ধরে ভারতের মতো দুরূহ একটি রাষ্ট্রযন্ত্র চালু রাখা চাট্টিখানি কথা নয় - ইংরেজ ফরাসী হদ্দ হয়ে যেত!

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতি সমস্যা সামলাবার ব্যাপারেও কতবার কত বিপজ্জনক অবস্থায় পড়তে হয়েছে—কিন্তু আমাদের আমলাতন্ত্র অকুতোভয়। আমলাতন্ত্রের সবচাইতে বড় সুবিধা এই যে, নতুন কিছু উদ্ভাবন করবার কোন অধিকার একে দেওয়া হয়নি। কেবল প্রিসিডেন্স দেখে, মানে আগে যেমন যেমন করা হয়েছে ঠিক তেমন তেমন চালিয়ে যাওয়া। আইন ও শৃঙ্খলা কেমন করে রক্ষা করতে হয় সংশ্লিষ্ট ফাইলে তার সবিস্তার নির্দেশ দেওয়া আছে। একটা ব্যবস্থায় কাজ না হলে তখন আর কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে, সব লেখা আছে, ফাইল অনুসরণ করলেই হল। আরও একটা কথা সকলের স্মরণ রাখা প্রয়োজন—কোন সমস্যার সমাধান করা আমলাতন্ত্রের কাজ নয়; আমলাতন্ত্রের কাজ হল সমস্যাকে সামাল দেওয়া। অর্থাৎ, সমস্যা থাকলেই তবে আমলাতন্ত্রের আবশ্যকতা। সমস্যা জীইয়ে রাখতে পারলে তাতে আমলাতন্ত্রেরই লাভ। সমস্যা

যদি ছড়িয়ে যায় তবে সেটা উপরি। অতএব পেশাগত কায়েমী স্বার্থের খাতিরেই আমলাতন্ত্রকে দিয়ে কোন সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

গত তিরিশ বছরে এই উপজাতি সমস্যার যে কোন সমাধান হয়নি তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব অতএব আমাদের আমলাতন্ত্রের। প্রয়োজন মত অন্য সবাইও যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। আমলাতন্ত্রের ডাক পেলেই দিল্লির রাজনৈতিক নেতারা কালবিলম্ব না করে ভাষণ দিয়েছেন, উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেছেন, শান্তি কমিটি বসিয়েছেন, বিদ্রোহীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, বৈঠক ভেঙেছেন, একের পর এক শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন, ভয় দেখিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন—আমলাতন্ত্রের চিত্রনাট্য যখন যেমন করতে বলেছে তখন তেমন করেছেন। সংবাদপত্রগুলিও কোনরকম বাগড়া দেয় নি। সমতলে কোথায়ও পান থেকে একটু চুন খসলে এরা অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে, তদন্ত দাবি করে, অবুঝা বুঝে নরম-গরম পরামর্শ দেয়। কিন্তু ত্রিশ বছরের উর্ধ্বকাল ধরে উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্রমবর্ধমান একটা এলাকায়, এমন বীভৎস একটা হাঙ্গামা থেকে থেকে ঘটেই চলেছে—অথচ তা নিয়ে এদের মধ্যে তেমন কোন উদ্বেগ নেই। এখানেও সেই একই চিত্রনাট্য— দর্শক ভোলাবার জন্য কখনো উষ্মা, কখনো ঘৃণা, কখনো বিস্ময়, কখনো হতাশা, কখনো প্রতিহিংসা এই সব ভাব প্রকাশ করা হয়। একেবারে বাঁধা-ধরা গৎ।

মাঝে মধ্যে তবুও একটু-আধটু গোলমাল হয়ে যায়। অতি আদর্শবান কেউ কেউ হঠাৎ উৎসাহের আধিক্যে চিত্রনাট্যের সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেন। কিছুদিন আগে ভারতের [illegible] প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই যেমন নাগা নেতা ও জড ফিজোর স[illegible]র্ধারিত আলাপ-আলোচনার সূত্রপাতেই এক তিড়িং-বিড়িং কা[illegible]লেন! নাগা নেতা ফিজো এবং মিজো নেতা লালডেঙ্গা[illegible]কে দিল্লির সুচিন্তিত পলিসি হল : নিজ নিজ এলাকায় [illegible]কৃত কোন

প্রভাব নেই —কিছুদিন ঝুলিয়ে রাখলে এরা আপনা থেকেই খসে পড়বে। তার আগে পর্যন্ত কেবল দেখিয়ে যেতে হবে যে ভারত এইসব বিপথগামীদের সম্পর্কে সব আশা একেবারে ছাড়েনি। কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লা সম্পর্কেও দিল্লির এক সময়ে ঠিক এই পলিসি ছিল। শের নাকি শেয়াল হয়ে গেছে! ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশরাও কংগ্রেসী নেতাদের সম্পর্কে এই একই পলিসি অনুসরণ করেছিল। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে, দিল্লি এখনো পোঁ ধরে আছে—ফিজো বা লালডেঙার সঙ্গে কোন রফা নয়। দিল্লির দাবি: কোন রকম আলাপ আলোচনার আগে নিঃশর্ত-ভাবে ভারতের সংবিধান সর্বাংশ মেনে নিতে হবে। দাবিটা একটু হাস্যকর। কেননা, সংবিধানটা যদি সর্বাংশে মেনে নেওয়াই হল, তা হলে আর, ওদের দিক থেকে, আলাপ-আলোচনার বাকি রইলটা কী?

এই অবাস্তব দাবিটির সঙ্গে সমান অবাস্তব একটা অভিযোগও আছে। এরা চুক্তি করে তার শর্ত পালন করে না, অস্ত্র সমর্পণ করবার বদলে অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলে। শর্ত লঙ্ঘনের ব্যাপারে কে কতটা আগুয়ান তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আসল প্রশ্ন হল—এইসব শান্তিচুক্তি কি যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশে সম্পাদিত হয়? উভয় পক্ষ স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর দিলে তবেই তাকে বলে চুক্তি। অধিকতর প্রতাপশালী প্রতিপক্ষের সৈন্যশিবিরে যা ঘটে তা চুক্তিপত্র নয়, বড় জোর সন্ধিপত্র। এহেন সন্ধিপত্র কখনোই স্থায়ী হয় না, স্থায়ী হতে পারে না, স্থায়ী হওয়া উচিত নয়।

কিন্তু এতসব সূক্ষ্ম তর্কে যাবার কোন প্রয়োজন নেই—আসলে সমস্যাটি সমাধান করবার কোন অভিপ্রায়ই আমাদের আমলাতন্ত্রের কোনকালে ছিল না, থাকবার কথাও নয়। তা ছাড়া, চুক্তিপত্রে ঢেরা-সহি করে বড় জোর সাময়িক সহাবস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে,

স্থায়ী সখ্যতা কদাচ নয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতি সমস্যার সমাধান করতে হলে সকলের আগে যা দরকার তা হল উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। আমরা ওদের বন্য, অর্ধসভ্য বলে অবজ্ঞা করতে থাকব, ওরা আমাদের শঠ, ধান্দাবাজ বলে ঘৃণা করতে থাকবে এবং তারমধ্যেই একটা চুক্তিপত্র সম্পাদন করে উভয়ের মধ্যে স্থায়ী আত্মীয়তা গড়ে উঠবে—এমন আশা করাই কপটতা। স্থায়ী সখ্যতার জন্য উভয়পক্ষকেই এগিয়ে আসতে হয়—উভয়পক্ষেরই এগিয়ে আসবার সুযোগ ও স্বাধীনতা থাকা চাই। জটিলতম সমস্যারও সমাধান সম্ভব হয় যদি উভয়পক্ষই সে-ব্যাপারে উৎসুক হয়—যদি উভয়পক্ষেরই উৎসুক হবার সুযোগ ও আকর্ষণ থাকে। তা নয়তো, ঘোড়াকে টানা-হ্যাঁচড়া করে জলের কিনারে টেনে নিয়ে যাবার মতোই সবকিছু পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়ায়।

এ ক্ষেত্রে, ভারত যেহেতু প্রবল পক্ষ অতএব ভারতকেই উদ্যোগী হতে হবে। এমন পরিবেশ ভারতকেই সৃষ্টি করতে হবে যেখানে উভয়পক্ষই নির্ভয়ে এবং অকপটে- সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়ে—সবকিছু আগোপান্ত বিচার করে দেখতে পারে। যে পরিবেশে, মিথ্যা-বিবি রাজি থাকলে হৃদয়ের লেন-দেন হয়। এমন পরিবেশ গড়ে তোলা কেবল ভারতের পক্ষেই সম্ভব।

কিন্তু গোড়াতেই প্রশ্ন উঠবে, ওরা যে মোটে আমাদের সঙ্গে থাকতেই চায় না—ভারত ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর—ওদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য আবার পরিবেশ সৃষ্টির কথা ওঠে কেন? প্রশ্নটায় একটু ত্রুটি আছে। কেন না, ভারত থেকে পৃথক হয়ে যাবার দাবিটা নিয়ে ওরা খুব একরোখা ভাব দেখালেও, দাবিটা যে একেবারে অনড় নয় তার প্রমাণ—ওরা বারংবার আলোচনায় বসছে, ভারত থেকে গণ্যমান্য কেউ লণ্ডনে গেলে ফিজো তাঁদের সঙ্গে নিজে থেকে এসে দেখা করেন।

উপজাতিরা আসলে নিতান্ত মূঢ় নয়। ওরা ভালো করেই জানে

যে ভূগোলের বিধান লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা ওদের নেই। ওরা জানে, ভারতের সঙ্গেই ওদের থাকতে হবে, এবং ভারতও চিরদিনই আকারে ও প্রতাপে বিরাট-বিশাল থাকবে। ওদের এই দাবিটার উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে আমরা আসলে নিজেদের ফাঁকি দেবার চেষ্টা করি, নিজেদের অক্ষমতা ঢাকবার চেষ্টা করি। এই ভৌগোলিক নিদানটির কথা মনে রাখলে আমরাও আরেকটু সহনশীল হতে পারতাম। সে যাইহোক, ওদের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে যখন আলোচনায় বসছি, ওরাও যখন আসছে, তখন পরিবেশটাকে একটু অনুকূল করে নিলে তা আমাদের সততার ও সদিচ্ছার প্রমাণ হবে। আর ওরা যখন গোঁ ধরেছে, ওরা যখন দুর্বল পক্ষ, তখন ফিজো অথবা লালডেঙার সঙ্গে বৈঠক করলেই বা ক্ষতি কি! জঘন্যতম লোকের সঙ্গেও তো আমরা সৌহার্দ বিনিময় করে থাকি!

অতএব সুনির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য যদি নাগাল্যাণ্ডে অথবা মিজোরামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কার্য-কলাপ কঠোরভাবে স্থগিত রাখা যায়, কিংবা সেনাবাহিনীকে তুলেই নেওয়া যায়, তা হলে ক্ষতি কি? সবাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাতে সম্পূর্ণ বানচাল হয়ে যাবে না। চীন এত বোকা নয় যে উত্তর ব্রহ্মের দুস্তর ও দুর্ভেদ্য অরণ্য-পর্বত অতিক্রম করে ঐ অঞ্চল দিয়ে ভারত আক্রমণ করবে—ভারতকে আবারও কাবু করতে হলে চীন থেকে আরও অনেক সহজ পথ আছে। অপরদিকে, নাগারা বা মিজোরা, সংখ্যায় নেহাতই মুষ্টিমেয়, যদি তেমন কোন বাঁদরামো করেই বসে, তবে আগে থাকতেই তাদের বলে দেওয়া হোক, যে তার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে তা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

এমনিভাবে পরিবেশটাকে সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত করে আলোচনায় বসলে হয়তো কিছু সুফল পাওয়া যেতেও পারে। চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি? তারপরে আমরা অন্তত এইটুকু জোর দিয়ে বলতে

পারব, যে আমাদের দকি থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি ঘটেনি। ভয়মুক্ত পরিবেশে খোলা মন নিয়ে আলোচনায় বসলে বোঝা যাবে যে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অটুট রেখে ভারতের পক্ষে কতটুকু ছাড় দেওয়া সম্ভব, আর ওদের পক্ষেই বা নিজেদের বৈশিষ্ট্য অক্ষত রেখে সার্বভৌমত্বের দাবিটার কতটুকু কাট-ছাট করা যায়। তার পরেও উভয়পক্ষ একমত না হতে পারে—কিন্তু তার সম্ভাবনা কম। আসল কথা হল, সততা ও সদিচ্ছার যদি অভাব না ঘটে তবে এমন আলোচনায় সুফল হতে বাধ্য। পৃথিবীতে এমন কোন সমস্যা নেই সদিচ্ছা থাকলে যার সমাধান হয় না। প্রথম বৈঠকেই হয়তো সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে না, সমস্যাটি দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং এর জট ছাড়াতেও সময় লাগবে, কিন্তু আস্তে আস্তে বরফ গলবেই।

উপরের প্রস্তাবটিকে নিছক কল্পনা-বিলাস বলে খারিজ করে দেবার আগে আমাদের মনে রাখা দরকার যে ত্রিশ বছরের ঊর্ধ্বকাল ধরে লড়াইটা চলছে। একদিকে সুবিশাল ভারতীয় সেনা বাহিনী এবং আরেক দিকে কতিপয় বৈরী মিজো-নাগা—লড়াইয়ের তবু কোন নিষ্পত্তি হয় না। ত্রিশ বছর ধরে চলেছে, হয়তো আরও ত্রিশ বছর ধরে চলবে। অন্যান্য উপজাতিরাও একে একে ক্ষেপে উঠছে, অস্ত্র ধারণ করছে। আসামের সমতলে এবং উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী এলাকায়ও আগুনের স্ফুলিঙ্গ এসে পড়ছে। এই সুবিস্তৃত এলাকাটাই হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ভিয়েতনামের চেহারা নেবে। ভারতের ভিয়েতনাম।

তার চাইতে অন্য পথটা একবার পরখ করে দেখলে ক্ষতি কি?

ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে এখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। অচিরেই এই আগুন নিভবে—এমনকি একটু স্তিমিত হবে—এমন আশা করবার কোন কারণ নেই। স্বয়ং দিল্লীও যে তেমন আশা করে না তা তার হম্বিতম্বির বহর দেখলেই বোঝা যায়। স্থানীয় এবং সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও এ-ব্যাপারে একেবারেই হালে পানি পাচ্ছেন না—কেউ না, এক জনও না। তাঁরা সবাই কেমন যেন হতভম্ব মেরে গেছেন। ছোট-বড়, স্বতঃস্ফূর্ত অথবা অনুপ্রাণীত, সাম্প্রদায়িক অথবা অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক অথবা আকস্মিক—এককথায় যেকোন আকারের অথবা প্রকারের উপদ্রব থেকেই কিছু-না-কিছু রাজনৈতিক ফায়দা তুলবার ব্যাপারে যাঁদের এতোদিনের পরিশীলিত পারদর্শীতা সেই তাঁরাও এ ব্যাপারে কিছুই করে উঠতে পারছেন না। দু-চার জন দুঃসাহসী নাক গলাবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের নাক ভোঁতা হয়ে গেছে।

আমলাতন্ত্র তথা প্রশাসন বাইরে দাঁত-খিঁচিয়ে আছে, কিন্তু ভিতরে থরহরি। গত ত্রিশ বছরের ঊর্দ্ধকাল এরাই আজকের এই দাবানলের ইন্ধন জুগিয়েছে—জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে। সেই ছড়ানো ছিটানো আগুনগুলো একত্র হয়ে আজকের এই দাবানল। সেই ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত অগ্নিশিখাগুলোকে নেভাবার দায়িত্ব এদের উপর ন্যস্ত ছিল। ব্রিটিশদের ছেড়ে যাওয়া ফাইলের উপর ভরসা করে যতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব ততদূর পর্যন্ত এঁরা অসম সাহসের সহিত অগ্রসর হয়েছেন—ফলাফলের কথা আদৌ বিচার না করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগুন সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়েছে ব্যাপকতর চেহারায় আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষায়। এমন স্থূল চাতুরি যে দীর্ঘদিন চলে না, চলতে পারে না, আমলাতন্ত্রের সকলেই সে-কথাটা হাড়ে

হাড়ে জানতেন। কিন্তু কিছুই করবার নেই—সুযোগ নেই, সাধ্য নেই, সৎসাহসও নেই। অগত্যা যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা আখের গুছোন, আর যাঁরা বোকা তাঁরা প্রতি সন্ধ্যায় আবশ্যিকভাবে মাতাল হন। ওদিকে আগুন ছড়াতে থাকে, অনুকূল হাওয়ায় মাঝে মাঝে দপ্ করে ওঠে।

এবারের আন্দোলনটির নাম দেওয়া হয়েছে—'বিদেশী হটাও'। পূর্বাঞ্চলে কে বিদেশী আর কে বিদেশী নয় তাই নিয়ে বর্তমানে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ভারত সরকারের তুমুল বাদানুবাদ শুরু হয়েছে এবং সেই হাওয়ায় আন্দোলনটি ক্রমেই আরো জোরদার হচ্ছে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এই আন্দোলন কেন্দ্র করে মেঘালয়ে মণিপুরে, ত্রিপুরায় অনেক রক্তপাত ঘটেছে এবং আরও অনেক রক্তপাত ঘটবেই। সর্বত্র এখনো খবর পৌঁছায়নি, কিন্তু এই সংকটের পরিণামে ভারত যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক চেহারাটাই পাল্টে যেতে পারে। অবশ্য এসব নিয়ে আমাদের উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই —মাথার উপরে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ আমলারা রয়েছেন, যখন যা করবার তাঁরাই করবেন।

কিন্তু এই আন্দোলনটির নাম যাই হোক, এর কৌলিক পরিচয় আজ আর কারো অজানা থাকবার কথা নয়। একথা ঠিক যে এবারের হাঙ্গামায় বাঙালী হিন্দু ছাড়া অন্যান্য দুটো-একটা জনগোষ্ঠীও কিছু কিছু নিগৃহীত হয়েছে, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে এবারের হাঙ্গামায়ও প্রহারটি এসে পড়েছে প্রধানত বাঙলী হিন্দুর উপর। যারা মারা গেছে তারা বাঙালী, যারা আহত হয়েছে তারা বাঙালী, যারা গুম হয়েছে তারা বাঙালী, যেসব নারী নিগৃহীতা হয়েছে তারা বাঙালী, যাদের ঘর-বাড়ি পুড়েছে তারা বাঙালী, যারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে নতুন করে উদ্বাস্তু হয়েছে তারাও বাঙালী। নাম যাই হোক, আসামের অন্যান্য 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলনগুলির সঙ্গে ক্রিয়া-পদ্ধতির দিক থেকে এই আন্দোলনের তেমন কোন তফাৎ নেই।

শোধনাগার অবরোধ, বাঁশ-প্লাইউড সরবরাহ বন্ধ করা এই সব কিছুর ও উদ্দেশ্য একটাই : তিন দশকের উপর দফায় দফায় খুন করে, প্রহার করে, ধর্ষণ করে, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে অপমানিত করে, সব রকম সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে—হাতে মেরে এবং ভাতে মেরে —যাদের ঝাড়ে-বংশে উৎখাত করা সম্ভব হয়নি, এবারে দিল্লীর উপর চাপ দিয়ে দিল্লীর সহায়তায় যদি তাদের রাজ্যছাড়া করা যায়। একবার এক অসমীয়া বন্ধু আমায় বলেছিলেন যে অসমীয়া ভাষায় বাঙ্গাল শব্দের আভিধানিক অর্থ বিদেশী। সেদিক থেকে বিদেশী শব্দের অর্থও বঙ্গাল। আর 'বিদেশী হঠাও' মানে 'বঙ্গাল খেদা।'

সে যাই হোক, এতে করে আবারও প্রমাণিত হল যে, আসামের সব আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত বাঙালী নির্যাতনে পর্যবসিত হয়। নতুন একটা শোধনাগার চাই, বাঙালী ঠেঙাও; কোন কারণে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, বাঙালী ঠেঙাও; মন্ত্রীসভা ফেলতে হবে, বাঙালী ঠেঙাও, নির্বাচন সমাসন্ন, বাঙালী ঠেঙাও; জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে, বাঙালী ঠেঙাও; অসমীয়া ভাষার পরিপুষ্টি চাই, বাঙালী ঠেঙাও; অর্থ নৈতিক সমস্যায় সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, বাঙালী ঠেঙাও; বেকার সমস্যা বিপজ্জনক হয়ে উঠল, বাঙালী ঠেঙাও। বাঙালী বিদ্বেষ আসামের যেন মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসামের সব ক্ষোভ, সব যন্ত্রণা, সব উত্তেজনা সবকিছু শেষ-পর্যন্ত এই বাঙালী বিদ্বেষে এসে শেষ হয়। এতে আসামেরই ক্ষতি হয়েছে সবচাইতে বেশি। স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমাগত আসাম এই বাঙালী-সমস্যা নিয়ে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে—অন্যান্য হাজারো সমস্যার দিকে ফিরেও তাকায়নি। সেই সমস্যাগুলো জটিল আকার ধারণ করে যতই আসামের ঘাড়ে চেপে বসছে আসামের বাঙালী বিদ্বেষও ততই নৃশংস ও কুটিল হয়ে উঠছে। দুর্বলের মনোবিকার এইরকমই হয়।

এখানেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আসামের এই বাঙালী বিদ্বেষ এমন মজ্জাগত ও বদ্ধমূল হল কেমন করে? এই বই-এর বিভিন্ন

প্রবন্ধে বিভিন্ন দিক থেকে এই প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করা হয়েছে। দেখা গেছে যে ইতিহাসের অমোঘ বিধানে এই বিরোধ অনিবার্য ছিল এবং ব্রিটিশ উপনিবাসদের উগ্র খোঁচানে সেই বিরোধ কুটিল ও জটিল হয়ে বর্তমান জাতীয় সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরও দেখা গেছে যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে গত ত্রিশ বৎসর উর্ধ্বকাল সংশ্লিষ্ট অথবা বিশ্লিষ্ট অমরা সবাই সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয় ভাবে এই বিরোধের আগুনে ইন্ধন জুগিয়েছি। রাজনৈতিক নেতারা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেননি সেইটে প্রত্যাশিত; আমলাতন্ত্র ব্রিটিদের রেখে যাওয়া ফাইল থেকে একেবারের তরেও মাথা তোলেননি সেইটে তাঁদের কর্মনিষ্ঠতার নির্দশন; বড়ো ব্যবসায়ী ও অপরাপর ভাগ্যন্বেগীরা এই গোলেমালে দু-পয়সা কামিয়ে নিয়েছে সেইটে তাঁদের পেশাগত বিচক্ষণতা; সংবাদপত্রগুলি পাড়ার নেড়ী কুকুরটির মতো প্রতিবার সময়কালে চুপ করে থেকে পরে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করেছে কারণ তারেই কয় আধুনিক সংবাদিকতা। আগুন নেভাবার দায়িত্ব যাদের উপর তাদের হোস্-পাইপ দিয়ে যদি জলের বদলে তেল বেরোয় তাহোলে তেমনি কাণ্ডই হয়—আসামে যা হয়েছে।

এই বিরোধের একটা নিষ্পত্তি হতে পারত যদি এর মধ্যে একটি পক্ষ অপর পক্ষকে সমূলে বিনাশ করতে পারত। তেমন চেষ্টা যে হয়নি তা বলা চলবে না, অবিচলিত নৃশংসতার সঙ্গে সে চেষ্টা আজও চলছে। এজন্য আসামের যাবতীয় সব জরুরী কাজ সুদীর্ঘ কাল স্থগিত হয়ে আছে এবং সেসব বকেয়া কাজ আসাম হয়তো আর কোনকালেই মেক-আপ করে উঠতে পারবে না, আসাম খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল তবু তাণ্ডব নৃত্য চলছেই। অপর পক্ষেও নাছোড়-বান্দা, মরছে কিন্তু বিনাশ হচ্ছে না, বরং সংখ্যায় কেবল বাড়ছেই। এর পেছনে কোন নিগূঢ় রহস্য নেই। এর কারণ আসামের বাঙালীর আজ আর কোথায়ও পালিয়ে যাবার জায়গা নেই।

বাঁচতে হলে তাকে আসামেই বাঁচতে হবে, মরতে হলেও আসামেই। সে আজ এমনি নিরাশ্রয় ও অসহায়।

বিরোধটা এমন কুৎসিত হয়ে উঠবার একটা বড় কারণ এই যে, ব্রিটিশ আমলের মুরুব্বির জোরে আসামে বাঙালীরা ছিল অত্যন্ত প্রবল। অপরদিকে, আধুনিক-কেতায় অনগ্রসর অসমীয়ারা ছিল নিতান্তই দুর্বল। প্রবল ও দুর্বলের মধ্যে কখনোই স্থায়ী সৌহার্দ্য হতে পারে না, উভয়-পক্ষের চেষ্টা যত্ন থাকলেও নয়। দুর্বলের সান্নিধ্যে প্রবল মাত্রাজ্ঞান ঠিক রাখতে পারে না। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর রাজনৈতিক-প্রশাসনিক যাবতীয় ক্ষমতা হস্তগত করে আসামীয়রা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠল। ঘরে-বাইরে দফায় দফায় মার খেয়ে বাঙালীরা হয়ে পড়লে নিতান্ত দুর্বল। মানে, চাকাটা পুরো এক পাক ঘুরে গেল। এতে করে বিরোধটা প্রশমিত তো হোলই না, বরং হিংস্রতর হল—জৈবিক কারণে। কথাটা আজ হয়তো দুর্বলের আত্মসান্ত্বনা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু চাকার ধর্মই যে ঘুরে যাওয়া সে-কথাটা আসামের পক্ষেও ভুলে যাওয়া নিরাপদ হবে না।

এ-ব্যাপারে আদি পাপ যে বাঙালীর সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। বিরোধের বীজটিকে নিজ হাতে বপন করে বাঙালীই অত্যন্ত যত্ন এবং উৎসাহ সহকারে চারাগাছটির প্রতিপালন ও পুষ্টিসাধন করেছে দীর্ঘদিন। এর পেছনে ঐতিহাসিক অনেক বাধ্যবাধকতা অবশ্যই ছিল এবং সেই সঙ্গে ছিল তৎসাময়িক অবাধ স্বার্থপরতা ও অগাধ আদর্শহীণতা। ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই, পাপ করলে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবেই। বাঙালীকেও অন্য সবাইকেও।

আসামের অত্যুগ্র পৃষ্টপোষকতায় বিরোধের বাড়ন্ত চারাগাছটি এতদিনে একটা বিপর্যয়কর মহীরূহ হয়ে উঠেছে—তার শিকড়ের টানে দিল্লীও আজ টলমল। সময়কালে বাঙালী যা যা ভুল করেছিল,

আসামও আজ ঠিক সেইমতো করে চলেছে—অনেক অনেক মাত্রা চড়িয়ে। এর ফলাফল কি হতে পারে ?

আমরা দেখেছি যে, আসাম থেকে কুলোর বাতাস দিয়ে সব বাঙালীকে বিদায় করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। এই রাবণের বংশ মরেও শেষ হবার নয়। বাঙালীরা আসামেই থাকবে এবং শত মার খেয়েও অসমীয়াদের পাড়া-প্রতিবেশী হয়েই থাকবে। পরস্পরের প্রতি বিরোধী মনোভাব নিয়ে দুটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী যদি ইতিহাসের অমোঘ বিধানে পাশাপাশি থাকতে বাধ্য হয় তবে তার পরিনাম যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে তার নক্কারজনক নজির এই উপমহাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসেই রয়েছে। হিন্দু মুসলমানের বিরোধ উপলক্ষ করে দেশ ভাগ হল, অথচ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় আজও মোরাদাবাদে একদিনেই শতাধিক ব্যক্তি খুন হয়। এতে অবাক হবার কিছু নেই। প্রকৃত কোন বিরোধকে ছেঁটে-কেটে শাসনে রাখবার চেষ্টা করলে এমনটাই ঘটতে বাধ্য। বিরোধটির নাগপাশ থেকে নিস্তার পাবার একটাই পথ, সেটি হোল বিরোধটির নিষ্পত্তি করা। এসব কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে থাকতেই আমাদের তৎসাময়িক সব তাবড় তাবড় দেশ নেতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—তাঁরা মনে রাখেননি। সেই পাপের বেতন আজ ভারতকে গুণতে হচ্ছে।

যে সংকীর্ণ লোভের পথ অনুসরণ করে ভারবর্ষ আজকের এই আড্ডায় এসে পৌঁছেছে, আসামও কি ঝোঁকের মাথায় সেই একই সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না ? আজকের আসামকে এই প্রশ্নটা একটু ভালো করে বিচার করে দেখতে হবে। গত কুড়ি বছরেরও কম সময়ের মধ্যে আসাম থেকে নাগাল্যাণ্ড বেরিয়ে গেছে, মিজোরাম বেরিয়ে গেছে ; মিকির পাহাড় একটা জাঁতের মতো যার সঙ্গে রক্তের যোগাযোগ নেই ; কাছাড় একটা ক্ষত যা কেবল যন্ত্রণা দেয় ; অরুণাচল চিরতরে হাতছাড়া হয়ে গেছে। তাছাড়া আসামে

যখনই কোন গোলমাল পাকিয়ে ওঠে উদয়াচলের দাবীটিও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আসামের ভূখণ্ড ইতিমধ্যেই ব্রহ্মপুত্র নদের তীরভূমিতে এসে ঠেকেছে, আর কিছুদিন পরে আসাম কোথায় দাঁড়িয়ে বাঙালীর নিকাশ করবে ?

এসব প্রশ্ন আসাম কালবিলম্ব না করে বিবেচনা করতে বসবে এমন আশা করা চলে না। গন্তব্যস্থলে দ্রুত পৌঁছবার লোভে একবার বাঘের পিঠে চেপে বসলে তারপরে আর বিবেচনা করে নেমে আসবার কোন উপায় থাকে না।

খুব স্থূলভাবে দেখলেও এই সমস্যাটি সমাধান করবার দায় বাঙালীরই। কেননা, এই বিরোধের বীজটি বাঙালীই রোপন করেছিল। এই বিষবৃক্ষের মূলচ্ছেদও বাঙালীকেই করতে হবে, ইতিহাসের সেইরকমই বিধান। ইতিহাসই নিজস্ব নির্মম পন্থায় যথাসময়ে বাঙালীর কানে ধরে এই কাজ করিয়ে নেবে। তার আগে নিছক আত্মরক্ষার জন্যই বাঙালীর এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। কারণ বিরোধের মারটা এসে পড়ছে বেছে বেছে বাঙালীর পিঠেই। প্রহারটা যখনই একটু প্রবল হয়ে ওঠে আসামের বাঙালীরা তখনই কেঁউ কেঁউ করে কেন্দ্রের কাছে নালিশ জানায়, পশ্চিমবঙ্গের কাছে সাহায্য প্রত্যাশা করে। দিল্লীর দরবারে এ-ব্যাপারে নালিশ জানানো যে কেবল অর্থহীনই নয়, অপমানকরও, সেকথা এ-গ্রন্থের বিভিন্ন লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিরোধের নিষ্পত্তি করবার অধিকার, ক্ষমতা অথবা সদিচ্ছা কিছুই দিল্লীর নেই, থাকবার কথাও নয়। দক্ষিণ ভারতীয় কোন প্রধান বিচারককে মাথায় বসিয়ে একটা কমিশন গঠন করলে তাতে ভারতীয়-গণতন্ত্রের ও আমাদের অতিপবিত্র সংবিধানের হয়তো মুখরক্ষা হয় কিন্তু বিরোধটির কোন ফয়সালা হয় না। বাইরে থেকে কেউ এসে এই অতি-জটিল সমস্যাটির একটা সুষ্ঠু সমাধান করে দিয়ে যাবে এমন হইতে পারে না, এমন হওয়া মঙ্গলজনকও নয়। অপরদিকে, পশ্চিমবঙ্গ নিজেই কোমর-

ভেঙে পড়ে খাবি খাচ্ছে। সেখানে সাহায্যের প্রার্থনা করে দেখা গেছে, কেবল সেই প্রার্থনার প্রতিধ্বনিটুকু ফিরে আসে— পশ্চিমবঙ্গের নিজের ভিটেয়ই ঘুঘু চড়ছে।

তাহোলে উপায় ? একটা উপায় হাল ছেড়ে দিয়ে সর্বনাশের দিকে গড়িয়ে যাওয়া—আসামের বাঙালীরা গত ত্রিশ বছরের উপর গভীর নিষ্ঠা সহকারে তাই করেছে। কিন্তু সর্বনাশের পরেও মর অস্তিত্বের একটুখানি অংশ অবশিষ্ট থেকেই যায়—হয়তো পিণ্ডদানের জন্যই। নিজেদের মর-অস্তিত্বটুকু বজায় রাখবার জন্যই আসামের বাঙালীকে এই বিরোধ নিষ্পত্তির কাজে উদ্যোগী হতে হবে। তার হয়ে এই কাজ অন্য কেউ করে দেবে না, করে দিতে পারবে না।

এই উদ্যোগের প্রথম কথাই হোল, বাঙালীকে সবল হতে হবে। কথাটি শুনে বাঙালীরাই যে সর্বপ্রথম ঠোঁট উল্টোবে সেকথা না বললেও চলে। আর তার যুক্তি সঙ্গত কারণও আছে। কিন্তু অরণ্যে রোদন করা হচ্ছে জেনেও এ-কথা বলতেই হবে যে, আসামের বাঙালীরা যদি আজও ঐক্যবদ্ধ হয়ে সবল হয়ে উঠতে না পারে তবে ভগবানও তাদের রক্ষা করতে পারবে না। ব্যাপারটিকে যতটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে আসলে কিন্তু তা নয়। আসামের শহরে ও গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, নিজেদের নিরাপত্তা বিধানের জৈব প্রয়োজনে বাঙালীরা যদি আজ পরস্পরের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় তবেই এই শুভকাজের সূচনা হতে পারে। অন্যান্য নির্যাতিত সংখ্যালঘুদেরও—লোক দেখাবার জন্য নয়—সক্রিয়ভাবে অবশ্যই সংগে নিতে হবে। রাজনৈতিক ধান্দাবাজদের যদি এই উদ্যোগে থেকে সরিয়ে রাখা যায়, তবে কিছুটা আত্ম-বিশ্বাস সহকারে এ-কাজ সফল হবেই। আদর্শের টানে বাঙালী আজ আর ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না, আত্মরক্ষার জৈব প্রয়োজনেও পারবে না। পারলে তাতে আসামের উপকার হবে, বাঙালীও বাঁচবে।

আসামের অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদীরা হয়তো প্রথমটায় একটু-ভীত ক্রুদ্ধ হবে। কিন্তু তাদের স্মরণ রাখা দরকার যে জার্মানী যতদিন

পর্যন্ত দুর্বল ও খণ্ড-বিখণ্ড ছিল ততদিন পর্যন্ত ফ্রান্সের সঙ্গে তার বিরোধ লেগেই থাকত। সেই বিরোধটা উভয় পক্ষেরই প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। তারপরে জার্মানি ক্রমে এক হল, সবল হল। জার্মানি ফ্রান্স এখন হাতে হাত মিলিয়ে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সমবায় প্রতিষ্ঠা করেছে, ইউরোপের পুরনো গৌরব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে। বাঙালীরা সবল হলে তখন আসামও প্রকৃতিস্থ হবার সুযোগ পাবে। দুর্বল প্রতিপক্ষ সবলের পক্ষেও অত্যন্ত ক্ষতিকর।

একথা সবাইকে মেনে নিতে হবে যে, পূর্বাঞ্চলে বাঙালীর উপস্থিতি একটা—ঐতিহাসিক ঘটনা আজ আর যার বড় চর হতে পারে না। পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যতদিন এই অমোঘ ঘটনাটি মেনে না নেবে ততদিন পূর্বাঞ্চলের অশান্তি ঘুচবে না, ঘুচতে পারে না। সময়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চল ততদিন পিছিয়ে পড়বেই। সারা দেশের শকুনি গার্বিনীরা ততদিন আখের গুছোবার জন্য এসে জুটবেই। এর একমাত্র প্রতিকার ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী-পূর্বাঞ্চল। যার একমাত্র শর্ত—ঐক্যবদ্ধ পূর্বাঞ্চলবাসী বাঙালী।

তবে ঐক্যবদ্ধ হতে চাইলেই যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায় না সেকথা স্বীকার করতেই হবে। ব্যাপারটি সময় সাপেক্ষ তো বটেই, সেই সঙ্গে কষ্টসাধ্য। এ যেন ঘরে যখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে তখন কুঁয়ো পাতবার পরামর্শ দেওয়া। কিন্তু বাঙালীর ঘরের আগুন অন্য কেউ এসে নিভিয়ে দেবে না, সেজন্য বাঙালীকেই কুঁয়ো খুঁড়ে জল বের করতে হবে - নাস্তি গতিরণ্যথা।

অন্যথায় কেবল পূর্বাঞ্চলে নয়, খোদ এই পশ্চিমবঙ্গেও, ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বারম্বার বাঙালীর উপর হামলা করবে, বাঙালীর ঘরে আগুন লাগাবে। সেই আগুনে বাঙালী পুড়বে, পূর্বাঞ্চলও রেহাই পাবে না দিল্লীও না! কেবল নিজের জন্য নয়, কেবল পূর্বাঞ্চলের জন্য নয়। সমগ্র ভারতের জন্যই বাঙালীকে আজ আরেকবার ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলে একতাবদ্ধ হতে হবে। নচেৎ—মরণং ধ্রুবং।